ওদের চোখে মোদের ভারত

পূর্ণেন্দু পত্রী

ওদের চোখে মোদের ভারত

পূর্ণেন্দু পত্রী

ওদের চোখে মোদের ভারত

48

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই ঃ

আমার রবীন্দ্রনাথ
পুরনো কলকাতার কথাচিত্র
কবিতার ঘর ও বাহির
আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা
প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ
হাসতে হাসতে খুন
শ্রেষ্ঠ কবিতা

ওদের চোখে মোদের ভারত

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত শীলমোহর

আলেকজাণ্ডার
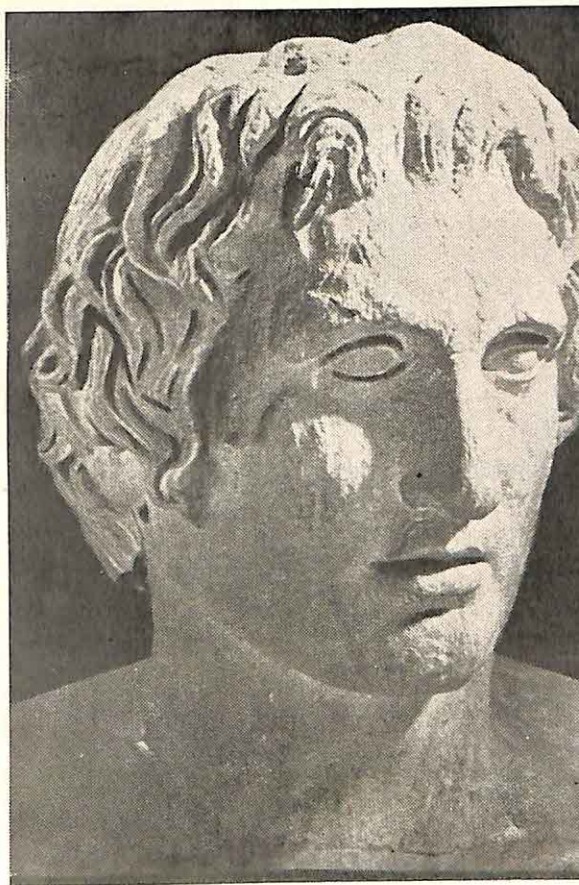
যোদ্ধার বেশে আলেকজাণ্ডার

ঙ্গা পার হচ্ছেন সুলতান মামুদ

হিউয়েন সাঙ

আলবেরুণী

ভারতকথা

আমরা যে দেশে বাস করি, তার নাম ভারতবর্ষ। বিরাট এই দেশ। পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র দিয়ে ধোওয়া। নদী এই দেশের গলার মালা। অরণ্য গায়ের রঙীন পোশাক। পাহাড়-পর্বত মাথার মুকুট। খুব প্রাচীন যুগে এদেশে এসেছে আর্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ। মধ্যযুগে এসেছে আরব, তুর্কী, আফগান, মোগল। এর পরের যুগে এসেছে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ। ভারতবর্ষ সকলকেই আলিঙ্গন দিয়েছে নিজের বুকে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ কত রকমের ধর্ম। ভাষাও বহু রকমের। আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি তাও নানান। সব বৈচিত্র্যই এখানে পাশপাশি। যেন একটা মালায় অনেক রঙের ফুল।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের দানও অনেকখানি। খুব প্রাচীনকালে পৃথিবীর অল্প যে কটা দেশে সভ্যতার আলো ফুটেছিল প্রথম, ভারতবর্ষ তাদের একটি। এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল একদিন। এদেশের মহামানব বুদ্ধের বাণী কান পেতে শুনেছিল পৃথিবী। আর্যভট্ট ভারতবর্ষেরই মানুষ। পঞ্চম

শতাব্দীতে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবী ঘোরে বলেই এমন অদল-বদল ঘটে দিন আর রাত্রিতে। নিউটনের পাঁচশো বছর আগে ভাস্করাচার্য জানিয়েছিলেন মাধ্যাকর্ষণের কথা। গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা আর সৃষ্টিতত্ত্বের বিজ্ঞান ভারতবাসীর কাছ থেকেই পৃথিবী নিয়েছে হাত পেতে। এখানেই প্রথম সোনার আবিষ্কার। এখানেই প্রথম লোহা গলানো, ইস্পাতের অস্ত্র, কাঁচের জিনিস বানানো। গাছপালা থেকে প্রথম ওষুধ। প্রথম এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কের গণনা। আর প্রথম শূন্যের আবিষ্কার।

এইসব শুনতে শুনতে তোমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন আদ্দিকালের ইতিহাস আমরা জানলাম কি করে? কেউ কি বলে দিয়েছে? নাকি লেখা ছিল কোন বইয়ে? না, এসব বলে দেয় নি কেউ। লেখাও ছিল না কোন একটা বইয়ে। আর একদিনে জানাও যায় নি এসব ইতিহাস। বহু বছর ধরে, বহু ভাবে, বহু জায়গা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় জোগাড় করা হয়েছে এইসব খবর। যে সব জিনিস থেকে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে প্রাচীন সাহিত্য আর ধর্মশাস্ত্র। যেমন ধরো বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এইসব। তারপর রাজা-রাজড়াদের নিজেদের লেখানো বংশাবলী অথবা জীবন-চরিত। আর আছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসপত্র। একে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এর মধ্যে আছে মুদ্রা, অর্থাৎ টাকা-পয়সা। আছে শীলমোহর, শিলালিপি, লিপি, সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ। আবার কখনো কখনো মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল বহু যুগের পুরনো গ্রাম-নগর। যেমন বেরিয়েছিল সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারোয়। কিংবা পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পায়।

এছাড়া আছে বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনা। বিদেশ যাওয়া এমন কিছু কঠিন নয় আজকাল। কিন্তু যখন মাটিতে রেলগাড়ি আর আকাশে এরোপ্লেন ছোটেনি, যখন পৃথিবীর কোন্ দিকে কোন্ দেশ, কোন্ সমুদ্র ছুটে গেছে কোন্ দিকে, এসব কিছুই জানা ছিল না মানুষের, তখন এক দেশ থেকে আরেক দূরের দেশে যাওয়া যে কী

রকমের দুঃসাধ্য কাজ ছিল তা নিশ্চয়ই ভাবতে পারো খুব সহজে। হাজার হাজার মাইল পথ কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ভুল ঠিকানার জাহাজে চেপে, দীর্ঘদিন ঝড়-জলে ডুবতে ডুবতে, কখনো পাহাড় ডিঙিয়ে, এক ফোঁটা জল নেই, এক বিন্দু ছায়া নেই, শুধু দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে এমন তেতে-ওঠা মরুভূমি পার হয়ে, তবুও এক দেশের মানুষ তখন ছুটে এসেছে আরেক দেশের মাটিতে। দেখতে, শুনতে, বুঝতে, শিখতে। তারপর নিজের দেশে ফিরে গিয়ে লিখেছে ভ্রমণ কাহিনী। সেইসব বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কোন্ রাজার আমলে কেমন ছিল সেই দেশ, কেমন ছিল দেশের ঘর-বাড়ি, ঘর-বাড়িতে কেমন ছিল মানুষ, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল কোন্ স্তরের, কেমন ফসল ফলতো মাটিতে, কেমন ছিল তখনকার আইন-কানুন। সব সময়েই যে বিদেশী ভ্রমণকারীদের সব কথা ঠিক ঠিক সত্যি, তা নয়। তবু ঠিকটুকু বুঝে নিতে পারা যায় অন্য উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে। তাই নিজের দেশকে জানার জন্যে বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনা বেশ দরকারের জিনিস।

গ্রীক দেশের একজন নামকরা ঐতিহাসিকের নাম হেরোডোটাস। আর পারস্য সম্রাট আরটাজারেকসস-এর একজন গ্রীক চিকিৎসকের নাম টেসিয়াস। এঁরা দুজন বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের মুখ থেকে শুনে শুনে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন একসময়। হেরোডোটাসের বর্ণনায় আছে অনেকখানি সত্যি। টেসিয়াসের বর্ণনায় আছে অনেক-খানি কল্পনা।

তারপর গ্রীস দেশের আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহলটা আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপে। এরপর ঐ গ্রীস দেশ থেকে এলেন সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস। গ্রীস-এর পর চীন দেশ থেকে এসেছেন অনেক ভ্রমণকারী। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এসেছিলেন সু-মা কিয়েন। তাঁকে বলা হয়, চীন দেশের হেরোডোটাস।

অর্থাৎ চীন দেশের ইতিহাসের জনক। এঁর লেখাতে ধর্মের কথাই বেশী। তবু তার মধ্যে ভারতবর্ষের অন্য বিবরণও রয়ে গেছে। এর পর ঐ চীন থেকেই এসেছিলেন আরও দুজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তার একজন ফা-হিয়েন। আরেক জন হিউয়েন সাঙ।

এরপর অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশ থেকে এসেছিলেন আল বেরুনী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালী থেকে মার্কো পোলো। আফ্রিকা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবন বতুতা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীন থেকে মা হুয়ান। এরপর ইতালী থেকে নিকোলো কন্টি। পারস্য থেকে আব্দুর রজ্জাক। রুশ দেশ থেকে আথেনেসিয়াস নিকিতিন। পোর্তুগাল থেকে পায়েজ আর নুনিজ। তারপর মোগল যুগে র‍্যালফ ফিচ, টমাস রো, টেভারনিয়ে, বার্নিয়ে, মানুচি। প্রত্যেকেই ভিন্ন দেশের মানুষ। কিন্তু এক জায়গায় সকলের মিল। এঁরা সকলেই ভালবেসেছিলেন ভারতবর্ষকে।

এই বইটিতে তাঁদেরই কয়েকজনের কাহিনী। অর্থাৎ তাঁদের চোখ দিয়ে দেখা ভারতবর্ষ।

মেগাস্থিনিস

ইতিহাসের বইয়ের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে আলেকজাণ্ডারের নাম। কোনো বইয়ে তিনি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। কোনো বইয়ে তিনি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। গ্রীস দেশের একজন প্রচণ্ড যোদ্ধা ছিলেন তিনি। তাঁর গুরু ছিলেন এ্যারিস্টোটল নামে এক বিখ্যাত দার্শনিক। শিষ্যকে তিনি খুব যত্ন নিয়ে মানুষ করেছিলেন বিদ্যায় বুদ্ধিতে। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল যুদ্ধ। আর দেশ জয় করার নেশা। সেই যুদ্ধের নেশাতেই পারস্য দেশের সম্রাটকে হারিয়ে একদিন ছুটে এলেন ভারতবর্ষের দিকে। খুব বেশী যুদ্ধ করতে হল না। ভারতবর্ষে তখন রাজায় রাজায় ঝগড়া। তাই দল বেঁধে বিদেশী শত্রুকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন না কেউ। যুদ্ধের আগেই আত্মসমর্পণ করে বসলেন অনেকে। ব্যতিক্রম শুধু পুরু আর কিছু কিছু ছোট-খাট রাজা।

ভারতবর্ষ জয় করে নিজের দেশে ফিরে গেলেন তিনি। যাবার সময় নিজের সেনাপতিদের বসিয়ে দিয়ে গেলেন জয়-করা রাজ্যগুলোর সিংহাসনে।

এসব খ্রীষ্টপূর্ব অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মানোর চারশো বছর আগের কথা। তখন মগধের সিংহাসনে ধননন্দ নামে এক রাজা। প্রজারা তাঁর উপর খুশী নয়। রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মনের ভিতরে টগবগ করছে অভিযোগ। প্রজারা যদি চোখের জল ফেলে, রাজা ভেসে যায়। নন্দ রাজাও তাই ভেসে গেলেন একদিন। তাঁকে ভাসিয়ে দিল তুজনের দক্ষতা। তার একজন হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। আরেক-জন চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের বাবা যখন যুদ্ধে প্রাণ হারান, চন্দ্রগুপ্ত তখন মা মুরার গর্ভে। মায়ের চোখে জল। মুখে তুঃখের মেঘ। অথচ মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সন্তানকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। ছুটে এলেন পাটলীপুত্রে। পাটলীপুত্র তখন মগধের রাজধানী। এখন যার নাম পাটনা। যথাসময়ে মায়ের গর্ভের অন্ধকার থেকে পৃথিবীর আলোয় জন্ম হল চন্দ্রগুপ্তের। আলোর মতনই ফুটফুটে ছেলে। যেন এক রত্তি জ্যোৎস্না। দেখে মনে হয় রাজপুত্তুর। আহা, এমন সোনার টুকরো ছেলে মাটিতে পড়ে, ধুলো-ময়লার বিছানায় গড়াগড়ি খায় কেন? দেখে মায়া হল এক রাখালের। পোষ্যপুত্র করে তাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। চন্দ্রগুপ্ত বড় হতে লাগল ধীরে ধীরে।

সেই সময় মগধের মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য নামে একজন ব্রাহ্মণ। তক্ষশিলার লোক। ইতিহাসে চাণক্যের আরো তুটো নাম। কৌটিল্য আর বিষ্ণুগুপ্ত। সেই চাণক্যের সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হয়ে গেল বালক চন্দ্রগুপ্তের। চন্দ্রগুপ্তের চোখে-মুখে চাণক্য দেখতে পেলেন রাজার ছেলের মতন ভাবভঙ্গী। চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। মানুষ করলেন নিজের হাতে। কেমন করে চালাতে হয় রাজ্য পাট, কেমন করে ছোটাতে হয় যুদ্ধের ঘোড়া, কেমন করে আক্রমণ করতে হয় শত্রুর তুর্গ, গড়তে হয় সৈন্যবাহিনী, শেখাতে লাগলেন সবই। এসবের পিছনে ছিল অন্য একটা ইচ্ছে। চাণক্য ছিলেন নন্দবংশের উপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তিনি চেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডারের সাহায্য নিয়ে প্রথমে মগধের সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করবেন নন্দবংশকে।

তারপর আরো শক্তি সংগ্রহ করে আক্রমণ করবেন আলেকজাণ্ডারকে। কিন্তু চাণক্যের সে ইচ্ছা কুঁড়িতেই গেল শুকিয়ে। ফুল হয়ে আর ফুটল না। চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন মগধ আক্রমণ করার। কিন্তু আলেকজাণ্ডার সামান্য এক যুবককে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এইরকম প্রস্তাব করার ঔদ্ধত্য দেখে, তখুনি আদেশ দিয়েছিলেন, একে হত্যা কর। চন্দ্রগুপ্ত সে যাত্রায় কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তারপর নিজেদের চেষ্টাতেই গড়ে তুলেছিলেন বিরাট সৈন্যবাহিনী। নন্দ বংশকে ধ্বংসও করেছিলেন নিজের শক্তিতে।

ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডার ফিরে গেছেন নিজের দেশে। তাঁর ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এক এক করে অনেকগুলো রাজ্য কেড়ে নিলেন গ্রীক সেনাপতিদের হাত থেকে। বিদেশীর শাসন থেকে মুক্ত হল ভারতবর্ষ।

আলেকজাণ্ডার মারা গেলেন। বলতে গেলে অকালেই। তাঁর মৃত্যুর ১৮ বছর পরে ভারতবর্ষের দরজায় সহসা আবার হানা দিল গ্রীক সৈন্যরা। এবারে যিনি যুদ্ধের নায়ক, তাঁর নাম সেলুকাস। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন ভারতবর্ষে। দেশটাকে দেখেছিলেন ভাল করে। তাই ভেবেছিলেন ভারতবর্ষ রয়ে গেছে আগের মতনই। এখনো চলেছে রাজার-রাজায় ঝগড়া-বিবাদ। যুদ্ধের নাম শুনলেই ভয়ে ভির্মি খাবে বুঝি সকলেই। ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ঢাল-তরোয়ালের ঝনঝনা শুনলেই ছুটে আসবে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু ১৮ বছর পরে এসে দেখলেন, বদলে গেছে ভারতবর্ষ। আর সেটা টের পেলেন চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লড়াই করতে পা বাড়িয়ে। চন্দ্রগুপ্তের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বুঝলেন, ভারতবর্ষের কব্জিতে এখন বিদেশী শত্রুকে আঘাত হানবার শক্তি যথেষ্ট। বাধ্য হয়েই সন্ধি। মাত্র ৫০০ টা হাতীর বদলে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে ফিরিয়ে দিলেন গ্রীকদের জয় করা অনেকগুলো রাজ্য। যেমন হিরাট, কাবুল, কান্দার, আর মকরান। এমন কথাও শোনা যায়,

দুই নায়ক নাকি পাতিয়েছিলেন আত্মীয়তার সম্বন্ধ। সেলুকাসের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

এরপর থেকে দু দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেলুকাস দেশে ফিরে গিয়েই ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক দূতকে। নাম মেগাস্থিনিস। এদেশে বহু বছর কাটিয়ে গেছেন তিনি। যদিও ঠিক কত বছর তা জানা যায় না। তাঁর কোন ছবি বা প্রতিকৃতিও খুঁজে পাওয়া যায়নি কোথাও। দীর্ঘদিন এদেশকে ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে, লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমণকাহিনী। নাম, ইণ্ডিকা। সে বই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। তবু তাঁর রচনা যে এখনো বেঁচে আছে, সে হল তাঁর সমকালের অন্যান্য ইতিহাস রচয়িতাদের রচনার মধ্যেকার উদ্ধৃতির জোরে। মেগাস্থিনিস থেকেই প্রচুর উপাদান পেয়েছিলেন তাঁরা। সেইসব ছড়ানো-ছিটানো অংশ জুড়ে জুড়েই মেগাস্থিনিসের বিবরণ। আর সেই বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি আদ্যিকালের ভারতবর্ষের অনেক কিছু খবর। দেখতে পাই অনেক অদেখা ছবি। মেগাস্থিনিস থাকতেন পাটলীপুত্রে। সেখান থেকেই ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের এদিক-ওদিক, এদেশ-ওদেশ। পুরুর রাজ্যেও ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। এই দুজন রাজার উপরই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বেশী।

ভারতবর্ষের যে দুটো নদীকে তাঁর চোখে ঠেকেছিল সবচেয়ে বড়, তাদের নাম হল সিন্ধু আর গঙ্গা। স্থল পথের চেয়ে তখনকার মানুষ নাকি বেশী যাতায়াত করত জল পথে। তবে বর্ষাকাল ছাড়া। বর্ষায় বানের জলে ভেসে যেতো মাঠ-ঘাট। বড় রাস্তাও ছিল একটা। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পাটলীপুত্র পর্যন্ত। রাস্তার দুপাশে গাছের ঘন ছায়া, আস্তাবল, স্নানের পুকুর, পথের নির্দেশ লেখা পাথর, বিশ্রামাগার আর জলের কুয়ো। গাছপালায় ছাওয়া এই দেশে তাঁর চোখে সবচেয়ে আশ্চর্যের ঠেকেছিল বটগাছ। পাঁচজন মানুষ তাদের দশটা হাতেও বেড় দিতে পারবে না এমন গুঁড়ি এক একটা গাছের। এদের মধ্যে একটা বিশেষ গাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি

লিখেছেন, এই একটা গাছের ছায়ায় খুব কম করে ৪০০ জন অশ্বারোহী দুপুর বেলার খর রোদ থেকে অনায়াসে বাঁচাতে পারে নিজেদের মাথা।

মেগাস্থিনিসের মতে সেই সময়কার ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় নগর হল পাটলীপুত্র। তাঁদের ভাষায়, প্যালিমবোথ্রা। রাজধানী ছিল গঙ্গার ধারে। লম্বায় ন' মাইল। চওড়ায় দেড় মাইল। নগরের চারদিকে পরিখা। পরিখার পর প্রাচীর। বাইরের লোক যাতে সহজে ঢুকতে না পারে। প্রাচীরের গায়ে ৬৪টা তোরণ আর ৫৭০ টা গম্বুজ। মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। কাঠ দিয়ে বানানো। যাতে আগুন না লাগে ব্যবস্থা ছিল তারও। গোটা প্রাসাদের গায়ে সোনা-রূপোর কারুকাজ। তাকালে চোখ ফেরান যায় না আর। পারস্যের খানদানী সম্রাটদের রাজধানীর চেয়েও পাটলীপুত্রের জাঁকজমক অনেক বেশী। রাজপ্রাসাদের সামনে ফুলের বাগান। বাগানে ময়ূর। গাছে গাছে নানান রঙের পাখি। বাগানের মাঝে মাঝে পুকুর। পুকুরে নানান রকমের মাছ। রাজার পোশাক হল সোনার জরি-বসানো মসলিন। রাজা আসা-যাওয়া করেন সোনার পালকিতে চেপে। দেশের ধনী লোকেরা চাপে হাতীর পিঠে অথবা রথে। বাকীরা ঘোড়া অথবা উটে। গাধার পিঠেও চাপতো অনেকে। সেটা কেউ ভাল চোখে দেখতো না। ছিল গরিবীয়ানার লক্ষণ। সাধারণভাবে ভারতবাসীরা তাঁর চোখে লেগেছিল লম্বা, ছিপছিপে কিন্তু স্বাস্থ্যবান। দীর্ঘ পরমায়ু ছিল তাদের। কারণ হিসাবে তাঁর মনে হয়েছে সাদাসিধে খাবার। আর মাদক জাতীয় পানীয় না-খাওয়া। শরীর খারাপ হলে তাঁরা পরামর্শ নিত যোগী অথবা ব্রাহ্মণ দার্শনিকের। যোগীরা বাস করতেন গভীর বনে। তাঁদের পরনে থাকত গাছের ছাল। যাকে বলা হয় বল্কল। ওষুধ বলতে তখন ছিল গাছের শিকড়-বাকড় অথবা ফুল। আর শারীরিক ব্যায়াম। সাধারণ মানুষের পোশাক সুতীর সাদা কাপড়। গায়ের রঙ কালো। ধুতি ছাড়া আরও একটা আবরণ ব্যবহার করত তারা। সেটা চাদর। মাথায় থাকত পাগড়ী। ধনীরা পরত রঙীন ঝলমলে মখমলের

পোশাক। কানে হাতীর দাঁতের ছুল। গায়ে সোনার গয়না। গলায় কখনও হার, কখনও ফুলের মালা। পায়ে পুরু গোড়ালী-ওয়ালা চামড়ার জুতো। হাতে ছাতা। অনেকেই তাদের দাড়ি রঙ করত নানা রঙে। কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও গোলাপী। ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে হত খুব অল্প বয়সে। পুরুষদের থাকত একাধিক স্ত্রী। বিয়েতে পণ নেবার প্রথা ছিল না। গরীবলোকেরা মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারলে মেয়েকে এনে বিক্রি করত বাজারে। বিয়ে হত যার যার নিজের শ্রেণী বা জাতির মধ্যে। মেগাস্থিনিসের মনে হয়েছিল ভারতীয়রা সাতটা জাতে ভাগ করা। যেমন দার্শনিক, কৃষক, পশু-পালক, শিল্পকার, বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক বা সভাসদ। দেশের বেশীর ভাগ লোকই চাষী। তারা বাস করে গ্রামে। ঘরে ঘরে অপর্যাপ্ত খাদ্য-শস্য, ফল-মূল। জমি উর্ব্বর। আবহাওয়া চমৎকার। মাঠে ফসল ফলত ছুবার। তা দেখে অবাক হয়েছেন মেগাস্থিনিস। মানুষের আচার-ব্যবহার ছিল সরল। চুরি ডাকাতির ভয় নেই। ঘরের দরজা খুলে রেখেই লোকে নিশ্চিন্তমনে বেরিয়ে যেত বাইরে। দেশে ছুর্ভিক্ষ মুখ বাড়াতে পারেনি কোনদিন। আর ছিল না দাসপ্রথা। মেগাস্থিনিসের এই ছুটো বক্তব্য সম্বন্ধে একালের ঐতি-হাসিকরা কিন্তু একমত নন। তাঁদের মতে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিত ঠিকই। তবে ভয়ংকর চেহারায় নয়। এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ। দাস প্রথাও ছিল। কিন্তু দাসেদের উপর অত্যাচার হত না। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল মজবুত। সকলেই চলত আইন মেনে। অথচ কোথাও কোন লিখিত আইন নেই। আইন হিসেবে মানা হত সেইসবকে যা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সই-স্বাক্ষর করে কেনা-বেচা বা চুক্তি হত না। হত মুখের কথায়। ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস ছিল মানুষের। মিথ্যে কথা বললে অথবা মিথ্যে সাক্ষী দিলে অপরাধীর হাত এবং পা কেটে দেওয়া হত। জ্ঞানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করত মানুষ। গুণগান গাইত সুর করে দেশের মহৎ মানুষদের নামে।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন খুব শক্তিশালী। তবুও প্রতিমুহূর্তে তাঁর ভয় ছিল নিজের প্রাণ নিয়ে। তখনকার দিনে সব রাজা-রাজড়াদেরই নাকি থাকত এই ভয়। এই বুঝি কেউ এসে বুকে বসিয়ে দেবে তলোয়ার। এই বুঝি খাবারে মিশিয়ে দিল বিষ। তাই নিয়ম ছিল তিনি খাবার মুখে দেবার আগে তাঁর সামনে অন্য কেউ সেটা মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে নেবে। একখানা ঘরে একটানা দুদিন তিনি শুতেন না। একদল সশস্ত্র মহিলা দেহরক্ষীরূপে ঘিরে থাকত তাঁকে। সারা দেশে ছড়ান ছিল গুপ্তচরের দল। সম্রাট প্রাসাদের বাইরে জনসাধারণের সামনে বেরুতেন চারটে কারণে। এক, বিচার। দুই, যুদ্ধ। তিন, শিকার। চার, পূজো-আচ্চার সময় বলিদানের বেলায়। যুদ্ধের জন্যে ছিল বিশেষ একটা পরিষদ। তার সদস্য সংখ্যা ৩০। পাঁচ জন করে সদস্য নিয়ে একটা করে বোর্ড। এইরকম ছ'টা বোর্ডের হাতে ছ'টা বিভাগ। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হস্তীবাহিনী, খাদ্য সরবরাহ, পরিবহন আর নৌবাহিনী। পদাতিক বাহিনীতে সৈন্য ছিল ৬ লক্ষ। সৈন্যরা যা বেতন পেত, সুখেই দিন কাটত তাতে।

সামরিক পরিষদের মতন আরেকটা পরিষদ ছিল রাজ্য শাসনের জন্যে। তার নাম নগর পরিষদ। সেখানেও মোট সদস্য ৩০ জন। প্রত্যেক বিভাগে পাঁচজন করে মোট ছ'টা বিভাগ। একটা বিভাগ দেখত উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল ঠিকমতন পাওয়া যাচ্ছে কিনা, যা উৎপন্ন হচ্ছে তার দর-দস্তুর কি রকম হওয়া উচিত, কোন্ কোন্ জিনিস বিক্রির পক্ষে উপযুক্ত সেগুলো পরীক্ষা করে তার উপর সরকারী ছাপ মারা, এইসব ছিল উৎপাদন বিভাগের কাজ। এর পর দ্বিতীয় বিভাগের কাজ ছিল বিদেশীদের দেখা-শোনা, যত্ন-আত্তি, অসুস্থদের চিকিৎসা, কেউ মারা গেলে কে হবে উত্তরাধিকারী তার দায়-দায়িত্ব। তৃতীয় বিভাগের কাজ পাটলীপুত্র নগরের জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা। চতুর্থ বিভাগের কাজ কেনা-বেচার জিনিসে মাপ বা ওজনের উপর নজর রাখা। পঞ্চম বিভাগের কাজ, যা উৎপন্ন হচ্ছে তা বিক্রির ব্যবস্থা করা। ষষ্ঠ বিভাগের কাজ ছিল

জিনিসের দামের কর আদায় করা। কর না দিলে, কিংবা কর দিতে গিয়ে প্রতারণা করলে প্রাণদণ্ড।

কর-এর ব্যাপারে ছিল দুটো ভাগ। এক হল বলি। দুই হল ভাগ। জমিতে যা ফলে রাজাকে দিতে হবে তার ছ'ভাগের এক ভাগ, রাজস্ব হিসেবে। সেটাই হচ্ছে ভাগ। আর বলি হল, উৎপন্ন দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ থেকে আট ভাগের এক ভাগ কর দেওয়া। এ ছাড়াও কর ছিল আরও নানা রকমের। বিক্রী করা জিনিসের দামের উপর কর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। জন্ম আর মৃত্যুর উপর কর। ছিল নানা রকম অপরাধের জরিমানা। এ ছাড়াও কর আদায় হত বন আর খনি থেকে।

চারটে প্রদেশে ভাগ করা ছিল চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য। উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, প্রাচ্য আর অবন্তী। এ ছাড়াও আর কিছু কিছু রাজ্য ছিল যা স্বায়ত্তশাসিত। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার ছিল যাদের হাতে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পদ হল প্রদেশপালের। এখন যেমন গভর্ণর। সাধারণতঃ রাজপরিবারের লোকেরাই পেত এই পদ। প্রদেশগুলো ভাগ করা ছিল অনেকগুলো জনপদে। জনপদের যিনি শাসক তাঁর নাম প্রদেশস্ত্রি। তাঁকে যিনি সহায়তা করেন তিনি সমাহরত্রি। এর পরের ধাপে স্থানিক। এঁর উপর জনপদের চার ভাগের এক ভাগ অংশের শাসনভার। পরের ধাপে গোপ। ইনি হচ্ছেন পাঁচ থেকে দশটা গ্রামের শাসক। এর পরের ধাপে গ্রামিক। ইনি মাত্র একটি গ্রামের শাসক।

জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখিদেরও অনেক বিবরণ লিখে গেছেন মেগাস্থিনিস। তিনি দেখেছেন বাঘ। যেমন তেজী, তেমনি বিরাট। বন কাঁপিয়ে চলা হাঁটা। অনেকে মনে করেন এরাই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পূর্বপুরুষ। দেখেছেন বুনো হাতী। এদের ধরে এনে তালিম দেওয়া হত যুদ্ধের জন্যে। কীভাবে হাতী ধরা হত সে গল্পও শুনিয়েছেন তিনি। ফাঁকা জায়গায় খোঁড়া হত একটা লম্বা খাদ। তার উপরে থাকত একটা সাঁকো। খাদটা থাকত

কাদামাটি খড়কুটো দিয়ে আড়াল করা। রাত যখন গভীর, তখন কতকগুলো পোষা এবং তালিম দিয়ে গড়া-পেটা হাতীকে এনে হাজির করা হত সেই খাদের কাছে। পোষা হাতীর ডাকে বুনো হাতীরা আস্‌তো ছুটে। আর তখুনি থপাস্ থপাস্ করে আছড়ে পড়ত খাদের ভিতরে। খাদের পাশেই শিকারীদের চালা ঘর। দল বেঁধে ছুটে আসত তারা। ধরা পড়া হাতীগুলোকে প্রথমে দুর্বল করা হত কোন কিছু খেতে না দিয়ে। তারপর তাদের নিস্তেজ শরীরের উপর আক্রমণ চালাত পোষা হাতীরা। এরপর তাদের নিয়ে যাওয়া হত গ্রামের ভিতরে।

মেগাস্থিনিস দেখেছেন, লম্বা লেজ আর কালো মুখওয়ালা বাঁদর। দেখেছেন তেজালো ঘোড়া। যারা টানত রথ। শুনেছেন টিয়ার মুখে মানুষের মতন কথা।

ভারতবর্ষ যে সোনার খনি আর মণিমুক্তোর দেশ সেটা তিনি আগেই জানতেন। এগুলো বাদে তাঁকে অবাক করেছিল আরও দুটো জিনিস। তার একটা হল মধু। আরেকটা উল। আসলে তিনি আখের গুড়কে ভেবেছিলেন মধু। আর তুলোকে উল।

তখনকার কালের আমোদ-প্রমোদ বা খেলাধূলা ছিল কুস্তি, দৌড়, জন্তু-জানোয়ারের লড়াই আর জুয়া। শরীর ম্যাসাজ করা হত আবলুস কাঠের বেলুন দিয়ে, অনেকটা লুচি বেলার ভঙ্গীতে।

এসবের বাইরে আছে এমন কিছু অলৌকিক বর্ণনা যা শুনলে মনে হবে আজগুবি। কেউ কেউ মনে করেন, এসব তাঁর চোখে দেখা নয়, অপরের মুখ থেকে শোনা। এই আজগুবি কাহিনীর মধ্যে আছে পিঁপড়ে আর মানুষ। তিনি নাকি দেখেছেন এমন পিঁপড়ে যা লম্বায়-চওড়ায় খ্যাঁকশিয়ালের মতন। সিন্ধু নদীর তীরে সেই পিঁপড়েরা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে টেনে আনত সোনা। সাধারণ মানুষ ছুটে আসত সোনার লোভে। বুনো জন্তু-জানোয়ারের মাংস দিয়ে ভুলিয়ে তারা পিঁপড়েকে টেনে নিয়ে যেত দূরে। তারপর নিজেরা কুড়িয়ে নিত সেই সোনা।

5. 1. 2011
14398

মানুষের বিবরণ এর চেয়ে আরো বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর। তিনি দেখেছেন ৯ ফুট লম্বা এমন মানুষ, যার নাক নেই। অন্য মানুষের এমন কান দেখেছেন যা কুলোর চেয়ে বড়। বিছানায় শুলে কান এসে ঠেকে যায় পায়ে। কোন মানুষের পায়ের গোড়ালীটা সামনে। আঙুলগুলো পিছনে। এমন মানুষও তিনি দেখেছেন, যার চোখ মাত্র একটি। আর সেটা কপালের মাঝখানে।

মেগাস্থিনিসের এইসব বিবরণ থেকে আমরা যে ভারতবর্ষকে দেখতে পাই, তা একদিকে যেমন ধনধান্যে ভরা, অন্যদিকে তেমনি শান্ত। সাধারণ মানুষ ব্যস্ত থাকতো নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ঘর-কন্না নিয়ে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, এক রাজার বিরুদ্ধে আরেক রাজার ষড়যন্ত্র, এসব নিয়ে নেই তাদের মাথা ঘামানো। ধনীর ঐশ্বর্য নিয়ে নেই ঈর্ষা। অকারণ কলহ-বিবাদে নেই তাদের আগ্রহ। নদী দেয় জল। গাছ দেয় ফল। মাঠ দেয় শস্য। রাজা দেন ন্যায় বিচার। তাই নিয়েই তারা আজীবন খুশী। রাজা বা সম্রাট আদর্শবান হলে একটা দেশ সোনার রঙে রাঙা হতে পারে কতখানি, মেগাস্থিনিসের বিবরণে সেইটেই ফুটে উঠেছে অক্ষরে অক্ষরে।

ফা-হিয়েন

চীন দেশের একটা ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের ভিতরে মাঠ। মাঠের ভিতরে একদল ছোট্ট ছেলে কাটছিল পাকা ধান। এমন সময় একদল দস্যু হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে তাদের সামনে এসে হাজির। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। চোখে রাঙা চাউনী। ছেলের দল ভয়ে দিশেহারা। যে যেদিকে পারল, পালাল ছুটে। কেবল একজন রইল দাঁড়িয়ে। তার চোখে ভয়ের লেশ নেই একটুকু। আছে সকাল বেলার রোদের মতন আভা। বালকটি এগিয়ে এল দস্যুদের সামনে, নির্ভয়ে। তাদের মুখের দিকে পদ্মের ছুটো পাপড়ির মত চোখ তুলে তাকাল। দেখল তাদের সর্বাঙ্গ। তারপর পাখির মতন গলায়, দস্যু সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললে,

—পূর্বজন্মে তোমরা অনেক পাপ করেছ। এ জন্মে তাই তোমাদের বাঁচতে হচ্ছে চুরি করে। আর চুরি কোরো না। তাহলে পরের জন্মে আরও বেশী দুঃখ পাবে।

একফোঁটা বালকের মুখে এমন কথা শুনবে আশা করেনি দস্যুরা। তারা অভিভূত হয়ে গেল নিমেষে। সাপুড়ের বাঁশীতে সাপের ছোবল-

তোলা ফণা যেমন নীচু হয়ে যায়, তেমনি করেই তারা মাথা নীচু করে, মাঠের ধান মাঠে ফেলে রেখে, হাতের অস্ত্র হাতে নিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিল ফিরে গেল সেই দিকে।

এই বালকটিই বিখ্যাত ফা-হিয়েন। যখন তিন বছর বয়স, সেই সময়েই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন তিনি। সেনসি রাজ্যের প্রধান শহরের নাম চ্যাংগান। সেই চ্যাংগান শহরের ছেলে। আসল নাম কুঙ্গ। দীক্ষা নেওয়ার পর নতুন নাম ফা-হিয়েন। যার মানে বিনয়ের প্রতিমূর্তি। এছাড়াও দীক্ষা নেওয়ার সময় উপাধি পেয়েছিলেন একটা। সি। সি-র মানে শাক্য নন্দন।

চীনে তখন বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। তৈরী হচ্ছে মঠের পর মঠ। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করা হচ্ছে চীনা ভাষায়। তবুও কিছু কিছু ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর মনের তলায় দেখা দিচ্ছে একটা সংশয়। যে-সব আচার-আচরণ তারা পালন করে চলেছেন দিনের পর দিন, তার কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক, কোন্ জিনিসটার আসল মানে কি, এসব জানা হবে কবে ? ফা-হিয়েনের কেবলই মনে হয়, আমরা যা পালন করে চলেছি, তা শুদ্ধ নয়, তা সম্পূর্ণ নয়। জানতে হলে একটাই পথ। বুদ্ধের জন্মভূমিতে যাওয়া। সেখানে গিয়ে শিক্ষা লাভ। সেখান থেকে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিপত্র নিয়ে আসা।

তিন বছর বয়স থেকে ফা-হিয়েনকে মঠে রেখে মানুষ করেছেন তার বাবা মা। বয়সের যখন পঁচিশে পা, ফা-হিয়েনের নিজের মনের মধ্যেই দেখা দিল বৌদ্ধধর্মকে আরও গভীর করে জানার ইচ্ছে। ফা-হিয়েন শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন কুমারজীবের। কুমারজীব ভারতবর্ষের একজন নামজাদা পণ্ডিত। কাশ্মীরে চলে যান ছেলেবেলায়। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী। তারপর থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। ২০ বছর বয়সে চলে এসেছিলেন কুচায়, বাবার কাছে। কুচা তখন মধ্য-এশিয়ার একটা জমজমাট শহর। সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনেরা দখল করে নিল কুচা। অন্য বন্দীদের সঙ্গে চীনে সৈন্যরা তাঁকেও নিয়ে চলে

গেল উত্তর চীনে। সেই থেকে তিনি চীন দেশে। বই লিখেছিলেন প্রায় ৪৭টার মতন। চীনে ভাষায় তর্জমাও করেছিলেন অনেক ভারতীয় বই বা পুঁথি।

দিন যায়। ফা-হিয়েনের মনের ভিতরে স্থিরশিখায় জ্বলতে থাকে একটা সংকল্পের প্রদীপ। সেই জ্যোতির্ময়ের দেশে একদিন যাবই। দেখতে দেখতে এসে গেল সেই শুভদিন। শিষ্য এসে প্রণাম করলেন গুরুর পায়ে। শিষ্যর বয়স তখন ৬৫।

গুরু প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছ ?

শিষ্যের উত্তর, ভারতবর্ষে। যাচ্ছি ভগবান তথাগতের পুণ্য জন্মভূমির ধুলো মাথায় নিয়ে ধন্য হতে। যাচ্ছি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরো জ্ঞানলাভের জন্যে। আর ইচ্ছে আছে, বিনয়পিটক নামে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পুঁথির মূলটাকে সংগ্রহ করা।

গুরু আশীর্বাদ করলেন। সেই সঙ্গে জানালেন—যদিও তোমার আসল কাজ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, তবুও যে দেশে যাচ্ছ, সে দেশের সব কিছুই তাকিয়ে দেখো। তুমি ফিরে এলে, তোমার চোখ দিয়ে এ দেশের মানুষ যেন দেখতে পায় একটা গোটা ভারতবর্ষের ছবি।

৩৯৯ সালের গোড়ার দিকে এক ভোরবেলায়, আকাশের পায়ের তলায় যখন সদ্য ফুটেছে আলোর প্রথম ফুলটি, ফা-হিয়েন পা বাড়ালেন ভারতবর্ষের দিকে।

সঙ্গে চার সঙ্গী। লুই চিং, তাও চিং, লুই হিং আর লুই ওয়েই। চীন থেকে ভারতবর্ষে আসার সোজা-সাপটা পথ আঁকা ছিল না তখন। আসতে হত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। জলহীন, ছায়াহীন জ্বলন্ত মরুভূমি পার হয়ে। যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে, এই কথাটা মনে রেখেই পাড়ি দিতে হত দূর-দুর্গম পথে।

গোবি ত মরুভূমি নয়। যেন একটা রাক্ষসের হাঁ। তার লক্‌লকে জিভের সবটাই দাউ দাউ বালি। সেই মরুভূমি পেরিয়ে খোটান। সেখান থেকে বরফে ঢাকা পামির পর্বতমালা ডিঙিয়ে সিন্ধুর তীরে। ফা-হিয়েন তখন বলতে গেলে সঙ্গীহীন। দু-জন সঙ্গী

দেশে ফিরে গেছে মাঝ-পথে, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে। লুই চিং মারা গেছে পথের মাঝখানে। ফা-হিয়েনের সঙ্গী শুধু একজন, তাও চিং। সিন্ধু পেরিয়ে তাঁরা পা বাড়ালেন গান্ধারের দিকে। সেখান থেকে তক্ষশিলা আর পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তারপর আফগানিস্তান ঘুরে মথুরা।

পায়ের যত ব্যথা, গায়ের যত জ্বালা, মনের যত আশঙ্কা সব এক নিমেষে জুড়িয়ে গেল ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে। চোখ ভরে উঠল বিস্ময়ে, মন আনন্দে। আহা ! এই ত সেই সোনার দেশ। শান্তির দেশ।

ফ-হিয়েন যখন পৌঁছলেন, তখন মেগাস্থিনিসের ভারতবর্ষে পৌঁছনোর সময় থেকে আরও ৭০০ বছর পার হয়ে গেছে। ভারত-বর্ষে তখন গুপ্তসাম্রাজ্য। প্রথমে সম্রাট ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তারপর সমুদ্রগুপ্ত। তারপর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ইতিহাসে বা উপকথায় সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে অনেক গল্প। তালবেতাল, বত্রিশ সিংহাসন এসব আরও কত কি। ইতিহাসের অনুমান, ঐ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সেই বিক্রমাদিত্য। তাঁর আমলেই সেই বিখ্যাত নবরত্ন সভা, যার শ্রেষ্ঠ রত্নটি ছিলেন কালিদাস। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল দুটো। পাটলিপুত্রে প্রথমটা। দ্বিতীয়টা পশ্চিম ভারত জয় করে প্রথমে বিদিশায়, তারপর বিদিশাকে বদল করে উজ্জয়িনীতে। মথুরায় পৌঁছে ফা-হিয়েন হাঁটতে লাগলেন যমুনার তীর ধরে। নদীর দু-পারেই বিহার। বিহার হল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আশ্রম। এখানেই তাঁরা থাকেন, খান-দান, পড়া-শুনা করেন। বিহারের চারপাশে থাকে বাগান। ফুলের গাছে ফুল। ফলের গাছে ফল। দিঘিতে টলটল জল। পাখির কাকলি গাছে গাছে। সূর্যের আলো গাছে গাছে। চন্দনের সুগন্ধ গাছে গাছে। তবে ভিক্ষু ছাড়া আর কারো সে বাগানে পা বাড়ানোর ক্ষমতা নেই। সংস্কৃত ভাষায় এই বিহারকে বলা হত সঙ্ঘারাম।

ফা-হিয়েন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন তাঁর স্বপ্নের দেশকে।

দেখলেন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা-রাজড়ারাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-বান। কোনো রাজা যখন ভিক্ষুকে কিছু দান করেন, মাথা থেকে খুলে নেন মুকুট। ভিক্ষুর মুখোমুখি বসতে হলে, বসেন মাটিতেই, কার্পেট বিছিয়ে। দেখলেন চারপাশের মানুষজন সকলেই সুখী। সাধারণ প্রজাদের কর দিতে হয় না রাজাকে। কর দেয় কেবল তারা, যারা চাষ করে রাজার জমি। রাজ্যে নেই মৃত্যুদণ্ড। অপরাধ যেমন, শাস্তি তেমন। লঘু অপরাধের গুরুদণ্ড নেই। যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কেবল তাদেরই শাস্তি দেওয়া হয় ডানহাত কেটে। চণ্ডাল ছাড়া প্রাণীহত্যা করে না কেউ। তবে রাজারা যান শিকারে। রাজ পরিবারের লোকজন এবং ধনীরা খান মাছ-মাংস। যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত, তাঁরাই কেবল ছোঁন না মাছ-মাংস, পেঁয়াজ, রসুন। চণ্ডাল বলা হয় তাদের, যারা স্বভাবে-চরিত্রে খারাপ। এদের বাস সমাজ থেকে দূরে। দোকানে-বাজারে আসার সময় হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে শব্দ করে হাঁটতে হয়। যাতে অন্যেরা সরে যেতে পারে তাদের ছায়া থেকে দূরে। এ থেকে বোঝা-যায়, সমাজে অস্পৃশ্যতা ছিল। সাধারণ নাগরিকরা মুরগি বা শুয়োর পোষে না। জীবিত প্রাণী বেচে না কেউ কাউকে। মাংস বিক্রি করে কেবল ঐ চণ্ডালেরা।

দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে না লাগে পাশপোর্ট, না কোনো অনুমতি। রাত্রে গৃহস্থরা যখন ঘুমোয়, ঘরের দরজা খোলা। রাস্তায় সোনা-দানা পড়ে থাকলেও ছোঁবে না কেউ। শহরে ধনীর সংখ্যা প্রচুর। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, কে কত ভালো কাজ করতে পারে।

দেখলেনই সত্যিই সুজলা-সুফলা এই দেশ। মাটি উর্বর। মাঠে মাঠে সোনার ফসল। মানুষেরা অতিথিপরায়ণ। বিদেশী অতিথিদের এমন আপ্যায়ন করে যেন কতকালের আপনজন।

যাতায়াতের পথঘাট, রাজপথ ছিল অনেক। রাজপথের ধারে ধারে সরাইখানা। দুধারে ছায়াময় গাছের সারি। স্নানের জলের কূপ। দেশে দাতব্য চিকিৎসালয় ছড়ানো। গরিব মানুষদের

পয়সা লাগে না ওষুধ খেতে। শুধু ওষুধ নয়, পথ্যও পেয়ে যায় বিনা পয়সায়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে কাউকে ছাড়া হয় না। দেশে মুদ্রার চলন ছিল। নাম দিনার। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম এত সস্তা যে, সাধারণ মানুষ কেনা-কাটা করত কড়ি দিয়ে।

রাজার আয়ের প্রধান উৎস, ভাগ। ভাগ বলা হত, জমিতে উৎপন্ন ফসলের ছ-ভাগের এক ভাগকে। রাজার পাওনা সেইটুকুই। এ ছাড়াও রাজার আয় অন্য নানা দিক থেকে। ছিল নদীতে খেয়া বাইবার কর। ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের শুল্ক। সৈন্য-সামন্ত দিয়ে চারপাশ ঘিরে রাখা দুর্গের মধ্যে যদি কেউ বাস করে, তার জন্যে আলাদা কর। কখনও কখনও বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হয়েছে রাজার। রাজকর্মচারীরা পেত মাস-মাইনে। চাকরিতে মাইনের বদলে জমি-জমা বা জায়গীর দেওয়ার চল হয় নি তখনও। চালু হয়নি বিষয় সম্পত্তি মাপজোখ করে রেজিষ্ট্রি করানোর প্রথা।

রাজধানী পাটলিপুত্র দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল ফা-হিয়েনের। সম্রাট অশোক একদিন দেশ শাসন করেছেন এখানে বসেই। খসতে খসতে, ঝরতে-ঝরতেও নগরের মাঝখানে তখনো টিকে রয়েছে তাঁর রাজপ্রাসাদ, সভাগৃহ ইত্যাদির স্মৃতি। ভেঙ্গেচুরে বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু বোঝা যায় এই সব স্থাপত্যের গায়ে কি অপূর্ব কারুকাজ ছিল একদিন। যেন মানুষের হাতে গড়া নয়। কোনো দৈত্য-দানব গড়ে দিয়ে গেছে মন্ত্রবলে। তখনকার বাড়ি-ঘর বেশির ভাগই কাঠের। তবে ইটের চলন শুরু হয়েছে একটু একটু করে।

ফা-হিয়েন মেগাস্থিনিসের মতন রাজদূত ছিলেন না। ছিলেন পরিব্রাজক। ভারতবর্ষে আসার প্রধান উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরো জ্ঞানলাভ। বুদ্ধের মৃত্যুর হাজার বছর পরে তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে দেশের সামাজিক বিবরণের চেয়ে তাই বৌদ্ধধর্মের কথাই বেশি।

দীর্ঘ মরু-যাত্রা শেষ করে যেদিন পা ফেলেছিলেন খোটানের মাটিতে, চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল পর্বতেঘেরা শ্যামল প্রকৃতির দিকে

তাকিয়ে। ফা-হিয়েনের মনে হয়েছিল, বুদ্ধের অনুরাগী বলেই এখানকার মানুষ এমন সুখী। এত সমৃদ্ধ পরিবার চারধারে।

বুদ্ধের শিষ্যরা তখন দুভাগে ভাগ করা। হীনযান আর মহাযান। হীনযানেরা ব্যস্ত নিজেদের মুক্তি নিয়ে। মহাযানরা চায় আগে জগতের যত মানুষ, যত পশু-পাখির মুক্তি হোক, সবার শেষে নিজের। খোটানে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন প্রচুর মহাযান। সেখানে ছিল যৌথ শস্যভাণ্ডার। সকলেই সেখান থেকে নিয়ে যায় যার যতটুকু দরকার, ততটুকু খাদ্যশস্য। প্রত্যেকের বাড়ি-ঘর বেশ সুন্দর করে সাজানো। বাড়ির গায়ে বাড়ি নয়। বেশ ছাড়া-ছাড়া। প্রত্যেক বাড়ির সামনে স্তূপের গড়নে একটা করে ঘর। সেটা বাইরে থেকে আসা অতিথিদের জন্যে।

ফা-হিয়েনের জন্যে খোটানের রাজা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গোমতি বিহার। ঐ বিহারে তখন প্রায় তিনহাজার ভিক্ষু। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটা বড় ভালো লেগেছিল ফা-হিয়েনের। ঘণ্টা বাজলেই সবাই একসঙ্গে খেতে আসবে ভোজনগৃহে। খেতে-খেতে কারো যদি আরও কোনো খাবার জিনিসের দরকার থাকে, সেটা তিনি জানাবেন হাতের ইশারায়। খেতে-খেতে কথা বলা নিষেধ।

প্রত্যেক বছরের চতুর্থ মাসে খোটানে বেরোত একটা শোভা-যাত্রা। ফা-হিয়েন সেই শোভাযাত্রা দেখবেন বলে ঐখানে থেকে গিয়েছিলেন আরো তিন মাস। চতুর্থ মাসের পয়লা তারিখ থেকেই শুরু হয়ে যায় রাস্তাঘাট, শহরের অলিগলি, বন-বাদাড় মুছে-কেটে-নিকিয়ে সাফ করা। তারপর সাজানো। চকচকে-ঝকঝকে বিরাট তাঁবু পড়ে নগরের দ্বারে। এই তাঁবুতে এসে উৎসবের সময় থাকবেন দেশের রাজা-রানী এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা। শহরের এক প্রান্তে থাকে একটা রথ। ৩০ ফুটের মতন উঁচু। আগাগোড়া সোনা রুপো দিয়ে মোড়া। সপ্তরত্নে সাজানো। সেই রথের মাঝখানে বসান হয় বুদ্ধের মূর্তি। দুপাশে দুই বোধিসত্ব। এ ছাড়া রথের চারপাশে নানা দেব-দেবী। শহরের প্রান্ত থেকে সেই

রথ টেনে আনা হয় শহরের দিকে। রথটা যখন নগরের দ্বারে একশ হাতের মধ্যে এসে যায়, সেই সময় রাজা বেরিয়ে আসেন তাঁবু থেকে। রাজার তখন অন্যরূপ। মাথায় নেই রাজমুকুট। গায়ে নেই রাজকীয় পোশাক। খালি গায়ে হয়তো শুধু উত্তরীয়। পায়ে নেই জুতো। হাতের পাত্রে ফুল আর ধুনো। রথের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন তিনি। হাতের ফুল ছড়িয়ে দেন রথের চারধারে। এরপর রথ চলতে থাকে। তখন রানী আর তাঁর সঙ্গীরা ফুল ছুঁড়তে থাকেন অবিরাম। ১৪ দিন ধরে চলে এই উৎসব। উৎসব শেষ হলে দরিদ্রের দান-ধ্যান।

ঐ খোটানেই রাজার গড়ে-দেওয়া একটা নতুন বিহার দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন ফা-হিয়েন। ২৫০ ফুট উঁচু। আশি বছর সময় লেগেছে তৈরি হতে। আরম্ভ করেছিলেন তখনকার রাজার ঠাকুর্দা। গোটা বিহারটা সোনা রুপো আর দামী দামী রত্ন দিয়ে সাজানো। বিহারের মধ্যেই প্রার্থনা করার ঘর। তার কড়িকাঠ, জানলা, দরজা, স্তম্ভ, সব কিছুই সোনার পাতে মোড়া।

তুষার জড়ানো ভুটান থেকে খালচায় এসে পৌঁছলেন ফা-হিয়েন। খালচাকে মনে করা হয় এখনকার কাশ্মীর। এখানেই রয়েছে বুদ্ধের ব্যবহার করা পাথরের পিকদানি। আর দাঁত। বুদ্ধের পূত অস্থি-র উপরে গড়া রয়েছে স্তূপ।

এরপর পামীর পেরিয়ে উত্তর ভারতের উড্ডিয়ান রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন ফা-হিয়েন। উড্ডিয়ান ছিল পাঞ্জাবের একটা অঞ্চল। ভগবান বুদ্ধ একবার এসেছিলেন উত্তর-ভারতে। এখানে যে শিলাখণ্ডের উপর রোদে শুকোতে দিতেন নিজের গায়ের উত্তরীয়, সেই পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে যত্ন করে।

এখান থেকে সুবাস্তু। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এখানে প্রচলিত আছে একটা কাহিনী।

দেবরাজ ইন্দ্রের মনে ইচ্ছে জাগল, তিনি পরীক্ষা করবেন বুদ্ধদেবকে। তৈরি করলেন দুটো পাখি। একটা বাজপাখি।

আরেকটা ঘুঘু পাখি। বাজপাখি এগিয়ে এল ঘুঘুপাখিকে আক্রমণ করতে। এক পক্ষের আক্রমণে আরেক পক্ষ ক্ষতবিক্ষত। ডানায় রক্তের দাগ। বুদ্ধদেব বিচলিত হলেন এই দৃশ্য দেখে। কি করে বাঁচান যায় ঘুঘুটাকে। নিজের শরীর থেকে তিনি কেটে নিলেন খানিকটা মাংস। বাজপাখিকে সেই মাংস দিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলেন ঘুঘুটির।

বুদ্ধত্ব পেয়ে গেছেন যখন, সেই সময় শিষ্যদের নিয়ে এখানে বেড়াতে এসে তিনি নিজেই নাকি বলেছিলেন, 'এই হল সেই জায়গা যেখানে আমি নিজের মাংসের বিনিময়ে কিনেছিলাম একটা ঘুঘুর জীবন।'

তারপর গান্ধার। সেখান থেকে তক্ষশীলা। এই তক্ষশীলায় বুদ্ধদেব একটা ক্ষুধার্ত বাঘিনীকে খাদ্য হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন নিজের শরীর।

তারপর তক্ষশীলা থেকে পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার।

একবার বুদ্ধদেব যখন পুরুষপুরে এসেছিলেন বেড়াতে, নিজের প্রিয় শিষ্য আনন্দকে ডেকে বলেছিলেন—'আমার পরিনির্বাণের পর কনিষ্ক নামে এক রাজা গড়ে তুলবেন একটা স্তূপ।'

ঠিক তাই-ই ঘটেছিল। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে একটা। কনিষ্ক এসেছেন পুরুষপুরে বেড়াতে। সেই সময় দেখলেন এক বাচ্চা ছেলে, মেষপালক, ধুলোবালি দিয়ে গড়ছে একটা স্তূপ। আসলে ঐ মেষপালক স্বয়ং ইন্দ্র। ছদ্মবেশে সেজেছেন মেষপালক। কনিষ্কের চোখে পড়ল এই দৃশ্য। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কি করছ তুমি?

বালকটির জবাব—স্তূপ গড়ছি বুদ্ধের জন্যে।

বালকের কথা শুনে কনিষ্কের মনেও দেখা দিল বুদ্ধর স্মরণে একটা স্তূপ গড়ার বাসনা। গড়লেনও। ৪০০ ফুট উঁচু। যেমন তার স্থাপত্য, তেমনি তার গায়ের কারুকার্য।

এই পুরুষপুরেই ছিল বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র। এই ভিক্ষাপাত্র নিয়েও রয়েছে কিংবদন্তি।

এক শক রাজা তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জয় করেছিলেন এই পুরুষ-পুর। কেউ কেউ মনে করেন এই রাজা হলেন কনিষ্কই। রাজা ছিলেন বুদ্ধের ভক্ত। দেশ জয় করে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি চাইলেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে। সুন্দর করে সাজানো একটা হাতির পিঠে রাখা হল ঐ ভিক্ষাপাত্র। আশ্চর্য কাণ্ড ! ভিক্ষাপাত্রটি চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা বসে পড়ল মাটিতে। আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। হাজার চেষ্টা করেও ওঠানো গেলনা তাকে। তখন আনা হল একটা চার-চাকার গাড়ি। ভিক্ষাপাত্রটি রাখা হল তার ভিতরে। আনা হল আটটা হাতি, গাড়িটাকে টানার জন্যে। কিন্তু এবারেও ঘটল সেই আশ্চর্য অঘটন। আটটা হাতিতে টেনেও নড়াতে পারল না গাড়ির চাকা। রাজা বুঝলেন, এ ভিক্ষাপাত্র এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রাজা তখন ঐখানেই গড়ে দিলেন একটা স্তূপ আর বিহার। একজন রক্ষী রাখলেন বিশেষ করে ঐ ভিক্ষাপাত্রটিকে পাহারা দেবার জন্যে।

আরও গল্প আছে এই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। ভিক্ষাপাত্রটি নাকি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে। শিষ্যরা চিন্তিত, কি হবে তাহলে ? স্বর্গের চারজন দেবতা তখন পাঠিয়ে দিলেন একটা ভিক্ষাপাত্র। আগাগোড়া পান্না দিয়ে তৈরি। বুদ্ধদেব তা নিলেন না। দেবতারা চারটে পাথরের ভিক্ষাপাত্র আনলেন তখন। বুদ্ধদেব চারটে ভিক্ষাপাত্রকে নিয়ে গড়লেন একটা। এই ভিক্ষাপাত্রে খুব বেশি হলে দু-কুনকে চাল ধরতে পারত। বাইরেটায় নানা রঙ। তার মধ্যে কালোটাই বেশি। আকার প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। দীন-দরিদ্র মানুষেরা যখন সেই ভিক্ষাপাত্রে সামান্য একটা ফুল উপহার দিত, পাত্র ভরে উঠত আপনা থেকেই। কিন্তু ধনীরা শত শত ফুল দিলেও সেটা ভরত না।

ফা-হিয়েন এরপর পা বাড়ালেন নগরহারের দিকে। নগর-হারের রাজধানীর মাঝখানে একটা স্তূপ। তার ভিতরে রয়েছে বুদ্ধের একটা দাঁত। রাজধানী থেকে এক যোজন দূরে আরেক জায়গায়

রাখা আছে বুদ্ধের হাতের লাঠিটি। লম্বায় ১৭ ফুট। চন্দনকাঠের তৈরি। ঐ বিহারের মধ্যেই রয়েছে তাঁর উত্তরীয়। যখনই জলাভাব দেখা দেয় দেশে, আকাশ পোড়ে আগুনে, মাটি ফাটে আগুনে, পুকুর শুকিয়ে যায় আগুনে, তখন দেশের মানুষেরা এই উত্তরীয়টিকে বিহারের বাইরে এনে পূজা করে। আর তার কিছুক্ষণ পরেই নামে ঘনঘোর বৃষ্টি। বুদ্ধদেবকে নিয়ে এরকম অজস্র কিংবদন্তি।

এই বিহার থেকে মাত্র আট যোজন দূরে গেলে দেখতে পাওয়া যায় একটা শিলাখণ্ড। অলৌকিক তার মাহাত্ম্য। দশ হাত দূর থেকে যদি এই শিলাখণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় কিছুক্ষণ, দেখা যাবে তার গায়ে ক্রমশ ফুটে উঠছে বুদ্ধের প্রতিমূর্তির আদল, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের। কিন্তু তখন যদি আরও কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যাবে সে মূর্তিটি ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছে মিলিয়ে। প্রবাদ আছে, এক হাজার বুদ্ধ নাকি তাঁদের মূর্তির ছায়া ফেলে যাবেন এই শিলাখণ্ডের উপর। কত রাজা তাঁর দেশ থেকে পাঠিয়ে দেন দেশের সেরা শিল্পীদের, ঐ মূর্তির প্রতিচ্ছবি এঁকে নিতে। কিন্তু কেউই পারেন নি তা আঁকতে।

এরপর মথুরা। মথুরা থেকে আঠারো যোজন দূরে একটা জায়গা। নাম সাংকাস্যসেৎ। এখানে এসে শুনলেন ভিক্ষুণী উৎপলার কাহিনী।

ভগবান বুদ্ধ তখন স্বর্গে, ইন্দ্রলোকে। গেছেন নিজের জননীকে ধর্মকথা শোনাতে। তিনমাস থাকবেন সেখানে। তিনমাস তো অনেকগুলো দিন। এতদিন ধরে দেখা না পেয়ে তাঁর ভক্তেরা, সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলক চোখে। কখন নামবেন তিনি আকাশ পথে। কখন আবার পৃথিবীর কালো অন্ধকার আলো হয়ে উঠবে তাঁর জ্যোতিতে। এমনি অধীর হয়ে যারা প্রতীক্ষা করছিল তাদের মধ্যে ছিলেন একজন ভিক্ষুণী। নাম উৎপলা। তিনি প্রার্থনা করে চললেন অবিরাম। হে বুদ্ধ, আপনি যখন আকাশপথে মর্তে নামবেন, তখন আমিই যেন প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি আপনাকে।

Library

দেখতে দেখতে তিনমাসের শেষ দিনটির রাত্রি ভোর হল। ভোর হতেই দেখা গেল, নীল আকাশে একটু একটু ফুটে উঠছে একটা তিনধাপের সিঁড়ি। যেন ইন্দ্রলোকের সমস্ত মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো সেটি। সেই সিঁড়ির মাঝখানের ধাপটিতে দাঁড়িয়ে আছেন বুদ্ধ। তাঁর দুপাশে আর দুটো সিঁড়ি। ডান দিকেরটা রুপোর তৈরি। বাঁ দিকেরটা সোনার। ডান দিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছেন ভগবান ব্রহ্মা। হাতে শাদা রঙের চামর। বাঁদিকের সিঁড়িতে দেবরাজ ইন্দ্র। হাতে রত্নখচিত ছাতা। ধরে আছেন বুদ্ধের মাথার উপর। এঁদের পিছনে ছিলেন আরও অনেক দেবতা। মর্তের দেবতাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে স্বর্গের দেবতারা নেমে এসেছিলেন মাটির দিকে। বুদ্ধ পৃথিবীর মাটিতে পা ছোঁয়ালেন ধীরে ধীরে। অমনি আকাশের গায়ে আঁকা সবকটি সিঁড়ি, সমস্ত দেবতা, নিমেষে গেল মিলিয়ে। মাটিতে পা দিয়ে প্রথম পুজো নিলেন ভিক্ষুণী উৎপলার হাত থেকেই।

মথুরা থেকে কান্যকুব্জ। কান্যকুব্জ থেকে গঙ্গা পার হয়ে হরিগ্রামে। এই হরিগ্রামে একদিন বুদ্ধ এসেছিলেন নিজের ধর্ম প্রচার করতে। তাঁর পুণ্য স্মৃতিতে এখানে গড়ে উঠেছে একটা স্তূপ। হরিগ্রাম থেকে তিন যোজন দূরে সাঁচী। এই সাঁচীতে দেখতে পেলেন সেই নিমগাছ। যে গাছের ডাল কেটে দাঁত মাজতেন বুদ্ধদেব। নিমগাছটি ৭ ফুট উঁচু। এখানকার ব্রাহ্মণরা রেগে গিয়ে সেই গাছটাকে কেটে ফেলেছে বহুবার। কিন্তু যতবারই কাটা হয়, ততবারই সেখানে গজিয়ে ওঠে গাছ। কোনোদিন সে নিমগাছকে কেউ মারতে পারেনি।

এবার শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎ রাজত্ব করতেন এখানে। বুদ্ধদেব যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন নিজের জননীকে ধর্মবাণী শোনাতে, তাঁর অদর্শনে তখন যেমন প্রজারা, তেমনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন রাজা প্রসেনজিৎও। সেই সময়ে গোশীর্ষ পাহাড়ের চন্দন গাছ কেটে বানিয়েছিলেন বুদ্ধের একটা প্রতিমূর্তি। সেইটেই নাকি বুদ্ধের প্রথম প্রতিকৃতি। তিনিই বুদ্ধমূর্তির প্রচলন করলেন প্রথম।

এরপর কপিলাবস্তু, লুম্বিনী পেরিয়ে রামগ্রাম রাজ্যে। এই দেশের রাজা বুদ্ধের পূতাস্থির উপর গড়েছিলেন একটা স্তূপ। তার পাশেই ছিল এক পুকুর। সেই পুকুরে বাস করত একটা দৈত্য। আর পাহারা দিত স্তূপ। সম্রাট অশোক একবার স্থির করলেন, বুদ্ধের পূতাস্থির উপর তৈরি আটটা স্তূপ ভেঙে দিয়ে গড়ে তুলবেন ৮৪ হাজার স্তূপ। পর পর সাতটা স্তূপ ভেঙে যখন আট নম্বর স্তূপটি ভাঙতে চলেছেন, তখন নাগদৈত্যটি অশোককে এনে দেখালেন কিছু অর্পণপাত্র। যেগুলো দেখলেই বোঝা যায় পাত্রগুলো মর্তের নয়, স্বর্গের। অশোক এরপর স্তূপ ভাঙা বন্ধ করে দিলেন।

এই ঘটনার পর থেকে একেবারে জনমানবহীন হয়ে গেল ঐ অঞ্চল। এমনকি ঐ যে নাগদৈত্য, সেও যেন চলে গেল কোথায়। কেবল কয়েকটা হাতি ঘোরাঘুরি করত ঐ স্তূপের কাছে। তারা শুঁড়ে করে বয়ে আনত জল আর ফুল। ছড়িয়ে দিত স্তূপের চারদিকে। অনেককাল পরে একজন বিদেশী ভিক্ষুকের চোখে পড়ল, এই নির্জন স্তূপের দুর্দশা। তখন তিনিই দেখাশোনা করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে রাজার চোখ খুলল। তিনি স্তূপের পাশে গড়ে দিলেন একটা বিহার। ক্রমশ আবার মরা জনপদ ভরে উঠতে লাগল মানুষের কলরবে।

ফা-হিয়েন এরপর পা বাড়ালেন বৈশালীর দিকে। এখান থেকেই বুদ্ধদেব যাত্রা করেছিলেন পরিনির্বাণ লাভ করতে। সেই সময় লিচ্ছবিরা তাঁর সঙ্গী হতে চায়। বাধা দেন বুদ্ধদেব। কিন্তু লিচ্ছবিরা বাধা মানে না। তখন তিনি করলেন কি পথের মাঝখানে তৈরি করলেন একটা পরিখা। লিচ্ছবিরা সে পরিখা পার হতে পারল না। সেখান থেকে বিদায় নেবার সময় লিচ্ছবিদের হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি। আর বলেছিলেন, এই দান নিয়ে তোমরা ফিরে যাও তোমাদের সংসারে।

এই বৈশালির উত্তর দিকে ছিল একটা বন। সেই বনের ভিতরে একটা দোতলা বিহার। সেই বিহারেই জীবনের শেষ দিনগুলো

কাটাতেন বুদ্ধদেব। এই বিহারের পাশে আরও একটা বিহার চোখে পড়েছিল ফা-হিয়েনের। সেটা বুদ্ধের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা সম্মান জানানোর জন্যে তৈরি করেছিলেন নটী অম্বাপালি বা আম্রপালি। আম্রপালির নষ্ট আর নগণ্য জীবন ধন্য হয়েছিল বুদ্ধের স্নেহে। বৌদ্ধদের কাছে আমের বাগান তীর্থস্থানের মতন পবিত্র। সেই কথাটা মনে রেখেই আম্রপালি একটা বিরাট আমবাগান দান করেছিলেন বুদ্ধদেবকে। বৈশালি থেকে চির বিদায় নেবার সময় বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'এই নগরীই হল আমার শেষ কর্মস্থল।'

বৈশালি থেকে পৌঁছলেন পঞ্চনদীর সঙ্গমে। সেখান থেকে এগোলেন পাটলিপুত্রের দিকে। এই রাজ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"মধ্যরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নগর হল পাটলিপুত্র। এখানকার মানুষেরা যেমন সুখী, তেমনি সম্পদশালী আর তেমনিই পরোপকারী। একে অপরের মঙ্গলের জন্যে ব্যস্ত। নগরীর ভিতরে আছে দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ওষুধ। দরিদ্র রোগীদের জন্য সেখানে থাওয়া থাকারও ব্যবস্থা। একেবারে নিরাময় না হলে কোন রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয় না।"

ফা-হিয়েন যখন পাটলিপুত্র থেকে বারানসী দেখে আরও দক্ষিণে এগোতে যাবেন, সেই সময় তাঁর চোখে পড়ে একটা আশ্চর্য বিহার। নাম, পারাবত-বিহার। একটা বিরাট পাহাড় কেটে তৈরি। বিহারের পাঁচটি তলা। প্রথম তলাটি দেখতে হাতির মতন। এর মধ্যে রয়েছে ৫০০টি ঘর। দ্বিতীয় তলাটি সিংহের মতন। এতে ঘর অছে ৪০০টি। তৃতীয় তলাটি ঘোড়ার মতন। এতে ৩০০ ঘর। চতুর্থ তলাটি ষাঁড়ের মতন। এতে ২০০ ঘর। পঞ্চম বা উপরের তলাটির আকৃতি পায়রার মতন। এতে ১০০টি ঘর। পাহাড়ের গায়ে আছে ঝর্ণা। বিহারটি এমন ভাবে তৈরি যাতে ঝর্ণার জল বিহারের প্রত্যেক তলার প্রত্যেকটা ঘরের সামনে দিয়ে বয়ে যেতে পারে। আলো এবং বাতাসের অভাব নেই কোনো ঘরে। ফা-হিয়েন বিস্মিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্থাপত্যের এমন অপূর্ব নিদর্শন দেখে।

পাটলিপুত্রের রাজা অজাতশত্রুর নতুন রাজধানী রাজগৃহের দিকে পা বাড়ালেন ফা-হিয়েন। সেই রাজগৃহের এখনকার নাম রাজগীর। এখান থেকে যান গয়ায় এবং বুদ্ধগয়ায়। তারপর আবার ফিরে আসেন পাটলিপুত্রে।

নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পুরো ১৪টা বছর ছিলেন বাইরে। ৬ বছর কেটেছে আসা-যাওয়ায়। ৬ বছর ছিলেন ভারতবর্ষে। ২ বছর সিংহলে। যে ৬ বছর ভারতবর্ষে ছিলেন তারমধ্যে ৩ বছর পাটলিপুত্রে। শেষ ২ বছর তাম্রলিপ্তিতে। প্রাচীনকালের একটা সেরা বন্দর ছিল এই তাম্রলিপ্ত। এখন যার নাম তমলুক।

ফা-হিয়েন যে সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন সেটা ভারতের স্বর্ণযুগ। সাহিত্য, শিক্ষা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর গা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে সোনার রোদের রঙ। সাহিত্যে তখন কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত। গণিত শাস্ত্রে আর্যভট্ট। জোতিষে বরাহমিহির। শিল্পে-ভাস্কর্যে অজন্তা, ইলোরা। বৌদ্ধস্তূপে সাঁচী, সারনাথ, ভারহুত। শিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বাণিজ্য চলেছে দেশ বিদেশের সঙ্গে। উপনিবেশ গড়ে উঠেছে নানান দেশে। এশিয়ার ঘরেঘরে ছড়িয়ে পড়েছে বুদ্ধের বাণী।

সিংহল থেকে সমুদ্রপথে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের দেশে। সেটা ৪১৩ সাল, ফা-হিয়েনের বয়স তখন ৭৯। ফিরে যাওয়ার সময় সঙ্গে ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রচুর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আর ছবি। ফিরে গিয়ে লিখলেন নিজের ভ্রমণকাহিনী। নাম ফো-কিউ-কি। বুদ্ধভূমির বিবরণ।

হিউয়েন সাঙ

ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল চিন। আবার কেউ বলে, ছেন য়ি। হোনান-ফু প্রদেশে বাড়ি। গ্রামের নাম দেন-পাও-কু। বাবার নাম ছেন হুই।

বাবা ছিলেন ধার্মিক। শ্রদ্ধা করত দেশ গাঁয়ের মানুষ। সুই রাজ বংশের পতন হতে আর বেশি দেরি নেই, এটা বুঝতে পেরেই তিনি কোনদিন সরকারি চাকরি করেন নি। বই পড়া আর জ্ঞান আহরণ, এই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা। তাঁর বাবা অর্থাৎ ছেন য়ি-র দাদু ছিলেন পিকিং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। বিদ্বান হিসেবে চতুর্দিকে তাঁর দারুণ খ্যাতি। এই কনফুসীয় পরিবারে ছেন য়ি-র জন্ম। সেটা ৭০১ খ্রীস্টাব্দ।

যেদিন জন্মেছিলেন, মা স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ছেলে চলেছে পশ্চিমে। মা জিজ্ঞেস করলেন, তুই তো আমার ছেলে। আমাকে ছেড়ে কোথায় চলেছিস তুই? সন্তানের মুখ থেকে উত্তর শুনলেন, চলেছি সত্যের সন্ধানে।

২৩ বছরে পা দিয়ে সেই ছেলে নিজেই একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন একদিন। তাঁর চোখের সামনে একটা বিশাল সমুদ্র। আর সেই

সমুদ্রের মাঝখানে বিশাল সুমেরু পর্বত। যেমন উজ্জ্বল তেমনি মহিমাময়। তাঁর মনে তখন প্রবল ইচ্ছে, পৌঁছতে হবে ঐ পর্বতের চূড়ায়। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের ঐ ঢেউগুলো দেখে ভয় পেলেন তিনি। ঐ ঢেউ কি পেঁাছতে দেবে আমাকে? কিন্তু ভয়ের চেয়ে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মনের প্রবল আগ্রহ। সব আশঙ্কা-উদ্বেগ ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার তলা থেকে তাঁর পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটা প্রকাণ্ড পদ্মফুল। আর সেই ফুলটাই তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল পর্বতের দিকে। পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছলেন তিনি। কিন্তু শিখরে উঠবেন কি করে? একেবারে খাড়াই পর্বত। পা রাখার জায়গা নেই কোনোখানে। এই চিন্তায় তিনি যখন বিমর্ষ, সেই সময় উঠল একটা দমকা হাওয়ার ঘূর্ণী ঝড়। আর সেই ঝড়টাই তাঁকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিল পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োটার উপর। সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন পৃথিবীর চারিদিক। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের দিগন্তমালা। যেসব দেশে ভ্রমণের ইচ্ছে তাঁর, সেইসব দেশের ছবিই যেন দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল এক স্বর্গীয় আনন্দে।

বয়স তখন ২৬। স্থির এবং দৃঢ় হলেন নিজের সিদ্ধান্তে। বেরিয়ে পড়তে হবে দেশ ছেড়ে, সত্যের সন্ধানে। কিছুকাল আগে সুই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল চীন দেশে। দেশ জুড়ে তখন অরাজকতা। দস্যুদের রাজত্ব। রাজধানীতে মানুষের বদলে বাস করছে বুনো জানোয়ারের ঝাঁক। পথে পথে শুকনো হাড়ের ছড়াছড়ি। পথের দুধারে আগুনে-পোড়া বাড়ি-ঘরের হাড়-কঙ্কাল। হত্যার আর্তনাদ আর অস্ত্রের ঝনঝনায়, আর অশ্বখুরের প্রখর শব্দে শিউরে শিউরে ওঠে আকাশ-বাতাস। যাঁরা ধার্মিক, তাঁদেরও নিস্তার নেই এই আক্রমণের হাত থেকে। সকলেই পালাতে ব্যস্ত। সারা চীনে তখন একমাত্র নিরাপদ জায়গা, স্‌সুচুয়ান প্রদেশের পর্বত।

দু বছর পরেই দেশের সিংহাসনে বসল নতুন সম্রাট, কাও সু।

চীন দেশে শুরু হল থাঙ সাম্রাজ্য। কাও সু-র পর সিংহাসনে বসলেন তাই সুং। সেটা ৬২৬ খৃষ্টাব্দ।

দু বছর পরে ২৮ বছর বয়সের সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালেন সম্রাটের দরবারে। সম্রাটের চোখে কৌতূহল।

—কি চাও তুমি?

—অনুমতি চাই ভারতবর্ষে যাওয়ার।

—কেন?

—আমার মনে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা। আমরা যতটুকু জানি, তার মধ্যে অনেকখানি রয়েছে ভুল। আমি শিক্ষা নিতে চাই, নালন্দায় গিয়ে। সংগ্রহ করতে চাই বৌদ্ধধর্মের মূল পুঁথি-পত্র।

সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাতে তুলে নিলেন একটা সুদৃশ্য পাত্র। তাতে রয়েছে সুস্বাদু পানীয়। এবার তিনি নীচু হয়ে মাটি থেকে তুলে নিলেন এক মুঠো ধুলো। মিশিয়ে দিলেন পানীয়ে। তারপর পাত্রটি এগিয়ে দিলেন যুবকটির দিকে। সম্রাটের পাত্র-মিত্র সভাসদেরা এই দৃশ্য দেখে হতবাক্। হতবাক্ যুবকটিও। পাত্র হাতে নিয়ে তিনি পাথরের মূর্তির মত স্থির। সম্রাট বললেন,

—কি হল, খাও, তুমি কি জান না, বিদেশের হাজারটা স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে স্বদেশের এক মুঠো ধুলোও অনেক বেশী মূল্যবান।

যুবকটি বুঝে গেলেন, সম্রাট অনুমতি দিতে নারাজ। রাজ-দরবার থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু নিজের সংকল্প ভুললেন না। ভারতবর্ষে, ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমিতে আমি যাবোই।

এই যুবকই বিশ্ববিখ্যাত হিউয়েন সাঙ।

আগে অনেকেই রাজী ছিলেন সঙ্গী হতে। কিন্তু সম্রাটের নিষেধ কানে আসার পর এক পলকে নিভে গেল তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। হিউয়েন সাঙ একাই বেরিয়ে পড়লেন, মন ভর্তি সাহস আর বুক ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে। বয়স তখন ২৮। দীর্ঘকায় চেহারা। দেখতে রূপবান। মুখে বুদ্ধির ছাপ। চোখে জ্ঞানের। হাঁটেন ধীরে। কথা বলেন

মেঘের মতো গলায়। গম্ভীর অথচ মধুর। গায়ে সুতোর ঢিলে পোশাক। কোমরে চওড়া কটিবন্ধ।

ভয় ছিল তাঁর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। সম্রাটের হুকুম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের প্রান্তে প্রান্তে, সীমান্ত-রক্ষীদের কানে কানে। কেউ যেন এক পা-ও না এগোতে পারে দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে। তার উপর সবচেয়ে বড় সমস্যা, ভারতবর্ষের দিকে যাওয়ার পথ তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা।

যাত্রা শুরু করে প্রথমে পৌঁছলেন চীনের পর্বতময় পশ্চিমপ্রান্তের লিআঙ শহরে। এখন যেটা কানসু। এরপর দুর্গম পথ। উত্তরে গোবি মরুভূমি। দক্ষিণে কোকোনরের বুনো মালভূমি। এখান থেকে এক পা বাড়াতে হলে, সম্রাটের পরোয়ানা দেখাতে হয়। কুড়ি মাইল দূরে দূরে রয়েছে পাঁচটা পাহারা স্তম্ভ। আর এমনই বিপদ, যে যাত্রা শুরু করতে না করতেই মারা গেল নিজের প্রিয় ঘোড়াটা। এই সময়ে গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে গেলেন, যেহেতু এখানকার শাসক ছিলেন বৌদ্ধ। কিনলেন একটা নতুন ঘোড়া। মন্দিরে গিয়ে বোধিসত্ব মৈত্রেয়র নামে প্রার্থনা করলেন, যেন সঙ্গী পান একটা। কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত জুটে গেল এক সঙ্গী। বয়সে যুবক। নাম প্যান-তু। বিদেশী। সে জানালে, ঐ পথ তার জানা। আগামীকাল তারা একসঙ্গে যাত্রা করবে। মনের আনন্দে হিউয়েন সাঙ তাঁকে উপহার দিয়ে বসলেন কিছু কাপড়-চোপড় আর অন্যান্য জিনিস।

পরের দিন প্যান-তু এসে হাজির হল। সঙ্গে লাল রঙের ঘোড়ায় চাপা এক বিদেশী বুড়ো। বললে, এই লোকটা রাস্তা-ঘাট সব জানে। একেই সঙ্গে দিচ্ছি। দাড়িওয়ালা বিদেশী বুড়োটা সাহসের বদলে ভয় দেখাতে লাগল হিউয়েন সাঙকে। কেন যাচ্ছ? দুর্গম পথ। মরুভূমির বালি আগুনের মতো গরম। নানান রকম চোরাবালি, ভূত-প্রেত, অপদেবতা রয়েছে পথে। তাদের হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া কঠিন। হিউয়েন সাঙ উত্তরে বললেন, মরি মরব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবই সেই ব্রাহ্মণের দেশে পৌঁছবার।

বিদেশী বুড়োটা শেষ পর্যন্ত নিজের লাল ঘোড়াটা দিয়ে, হিউয়েন সাঙের ঘোড়াটা নিয়ে সরে পড়ল। হিউয়েন সাঙের সঙ্গী হলেন সেই যুবকটি। খানিকটা যাওয়ার পর পথে পড়ল নদী। সঙ্গী যুবকটি গাছ কেটে, গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানিয়ে ফেললে একটা সেতু। নদীর যেখানটা সবচেয়ে কম চওড়া, সেইখানে। ঘোড়ায় চেপে নদী পার হয়ে কী আনন্দ হিউয়েন সাঙের মনে। নদীর এপারে এসে বিশ্রাম নিলেন দুজনে। শরীর আজ ভয়ঙ্কর ক্লান্ত। শুতেই এসে গেল ঘুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলেন, তাঁর যুবক সঙ্গীটি শানানো ছুরি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। হিউয়েন সাঙ নিজেকে মগ্ন করলেন ভগবান বোধিসত্ত্বের ধ্যানে। তাঁর ঐ ধ্যানমূর্তি দেখে যুবকটি আর এগোল না।

কিন্তু যুবকটি এরপর আর রাজি হল না তাঁর সঙ্গে যেতে। একা হয়ে গেলেন তিনি। এবার বেছে নিলেন এগোবার এক নতুন কৌশল। দিনে লুকিয়ে থাকেন শুকনো খানা-খন্দের আড়ালে। পথ হাঁটেন রাতের অন্ধকারে। নিজের ছায়া আর মরুভূমি জুড়ে ছড়ানো উটের মল আর মরা মানুষের হাড়, এই দেখে দেখে পথ চিনে।

চলতে চলতে একদিন একটা জলাশয়ের ধারে বসে নিজের জলের পাত্রটি ভরছেন। এমন সময় সাঁ সাঁ করে কয়েকটা তীর ছুটে এল সেই দিকে। তিনি বুঝলেন, প্রহরীরা দেখতে পেয়ে গেছে তাঁকে। তিনি ডাঙায় উঠে এসে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে জানালেন,

—আমি একজন ভিক্ষু। আমাকে তীর ছুঁড়ে মেরো না।

ছুটে এল প্রহরীরা। বন্দী করে নিয়ে গেল কাছাকাছি দুর্গের অধিনায়কের কাছে।

দুর্গের যিনি অধিনায়ক তিনি নিজেও ছিলেন একজন বৌদ্ধ। অধিনায়ক তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সাদরে। অনুরোধ জানালেন, ফিরে যেতে।

হিউয়েন সাঙ তাঁর সংকল্পে অটল। তিনি জানালেন, আপনি যদি আটকে রাখতে চান, আমি আপনার হাতে আমার জীবন

বলিদান দিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার পক্ষে পিছন পানে আর এক পা হাঁটাও সম্ভব নয়।

অধিনায়ক হার মানলেন হিউয়েন সাঙের জীবন-পণ-করা অভিপ্রায়ের কাছে। তখন নিজেই এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। পাথেয় দিলেন। পথ বলে দিলেন। পরবর্তী দুর্গের অধিনায়কের নামে লিখে দিলেন পরিচয়-পত্র। আর সাবধান করে দিলেন, শেষ পাহারা স্তম্ভটিকে (ওয়াচ-টাওয়ার) এড়িয়ে চলার জন্য। কারণ ঐ টাওয়ারের অধিনায়ক, বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী। হিউয়েন সাঙ এসব ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্যে ধরলেন এমন এক হাঁটা-পথ যা তাঁকে পৌঁছে দিল এক বিপুল শূন্যতার রাজ্যে। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই, গাছ-গাছালির চিহ্ন নেই। না ওড়ে একটা পাখি। না আছে কোথাও জলের রেখা। না একগাছা সবুজ তৃণ। হাঁটতে হাঁটতে পথ হারিয়ে ফেললেন। ভয়ে-ভাবনায় তিনি তখন প্রায় আধখানা। তবু সাহসে ভর দিয়ে আর নিজের ছায়াকেই একমাত্র সঙ্গী করে হেঁটে চললেন অজানা পথে।

আসলে সেটা এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। গোবি। পুরনো নাম সা-হো। অর্থাৎ বালির নদী। নতুন নাম সো-কিয়া-সের। ৮০০ লি চওড়া। কোনমতে ১০০ লি-র মত হেঁটে নিজের জলাধার থেকে জল খেতে গেলেন। ভারী জলপাত্রটি সেই সময় পড়ে গেল হাত থেকে। তারপর পাঁচটা দিন আর চারটে রাত এক ফোঁটা জল পেলেন না কোথাও তেষ্টা মেটানোর। তাঁর পাকস্থলী পুড়ে যাচ্ছিল। শরীরে আর জোর নেই এক পা হাঁটার।

আগুন-তাতা বালির উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন ভগবান তথাগতের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ পাঁচ রাত্রির মাথায় উঠল হাওয়ার ঝড়। যেন তাঁকে বরফের জলে স্নান করিয়ে দিয়ে গেল সেই হাওয়া। তাঁর আধমরা ঘোড়াটাও খাড়া হয়ে দাঁড়াল তখন। আবার শুরু হল হাঁটা। হেঁটেছেন মাত্র ১০ লি। এমন সময় তাঁর ঘোড়া বাঁক নিল অন্য পথে। তাকে আর ফেরানো যায়

না। সেইভাবে কয়েক লি যাওয়ার পরই তাঁর চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য। মরুভূমির মাঝখানে তৃণভূমি। সবুজ ঘাস। আয়নার মত স্বচ্ছ জলের ঝর্ণা। তিনি ছুটে গিয়ে জল খেলেন আকণ্ঠ ভরে। তাঁর ঘোড়া খেল ঘাস। নতুন জীবন ফিরে পেলেন তিনি। নতুন উৎসাহ। ভরে নিলেন নিজের জলাধার। ঘোড়ার জন্যে ঘাস কেটে নিলেন বেশ খানিকটা, তারপর আবার শুরু হল পুবমুখো হাঁটা।

দুদিন হাঁটার পর মরুভূমির পথ শেষ। পৌঁছলেন আই-গু মন্দিরে। মন্দিরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আরেক জ্ঞানী স্বদেশবাসীকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। দুজনেরই চোখে আনন্দের অশ্রুজল। কাউ-চাঙ-এর রাজা খিও-ওয়েন-তাই। এই কাউ-চাঙ-ই এখনকার তুরফান। রাজা দূতের মুখে খবর পেলেন হিউয়েন সাঙ এসেছেন আই-গুতে। দশদিন পরে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বেশ কিছু পাত্র-মিত্র আর বেশ কয়েকটি তাজা ঘোড়া নিয়ে এসে পৌঁছলেন সেখানে। তাঁর কণ্ঠস্বরে সবিনয় নিবেদন,

—আমাদের রাজা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

হিউয়েন সাঙের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাজি হলেন। ছদিন ধরে মরুভূমির পথ পেরিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন রাজধানী পি-লিতে। তখন সন্ধে। নিজের ঘোড়াটি ছেড়ে দিয়ে রাজার পাঠানো ঘোড়ায় চেপে চললেন রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজা নিজেই এগিয়ে এলেন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। তখন রাত্রি। রাজ্যে কারো চোখে ঘুম ছিল না সেদিন। না রাজার, না প্রজার। রাজার পরে রানী এলেন দাস-দাসী সহ।

রাজা অনুরোধ করলেন, আপনি এখানেই থেকে যান। হিউয়েন সাঙ জানালেন, আমি রাজকীয় আতিথ্যলাভের জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসিনি। এসেছি জ্ঞানের সন্ধানে।

রাজার পক্ষ থেকে ক্রমাগত অনুরোধ। অথচ হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়ানোর জন্যে অধীর। শেষে ক্রুদ্ধ রাজা একসময়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন,

—আপনি যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, আমি বাধ্য হবো জোর করে আপনাকে আটকে রাখতে। বন্দী করে ফেরত পাঠিয়ে দেবো নিজের দেশে।

প্রতিবাদে হিউয়েন সাঙ শুরু করলেন অনশন। যেন পাথরের মূর্তি, এমন অনড়, অটল। তিনদিন মুখে ছোঁয়ালেন না এক ফোঁটা জল। চতুর্থ দিনে রাজার বুকটা উঠল কেঁপে। দেখলেন হিউয়েন সাঙ-এর বুকে নিশ্বাস বইছে, যেন এক ফোঁটা একটা পাখির মতন। রাজা এসে লুটিয়ে পড়লেন পায়ে।

—প্রভু, আপনি আপনার নিজের পথে যাত্রা করুন। তবে ফেরার পথে আমার রাজ্যে আপনি তিন বছর থেকে যাবেন, এইটেই আমার একমাত্র বিনীত অনুরোধ।

যাওয়া যখন ঠিকঠাক, রাজা তখন তুরফানে এক মাসের মত একটা ধর্মসভার আয়োজন করলেন। রঙিন চাঁদোয়ার নিচে বেদি। বেদির উপরে হিউয়েন সাঙ। সামনে বসে আছেন রাজ্যের তিনশ সম্ভ্রান্ত মানুষ। তা ছাড়া আছেন রাজা, মন্ত্রী, রাজকর্মচারীরা। প্রতিদিন রাজা সভায় আসতেন হাতে গন্ধদ্রব্যের একটা পাত্র নিয়ে। রাখতেন ধর্মগুরুর পায়ের কাছে।

যাওয়ার দিন রাজ্য জুড়ে ব্যস্ততা। গত একমাস ধরে রাজার আদেশে হিউয়েন সাঙ-এর জন্যে তৈরি হয়েছেনানা উপহারের জিনিস। পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনা-রুপোর জিনিস, সাটিন-রেশম, আরও কত কি। বেছে বেছে তিরিশটা ঘোড়া আর চব্বিশজন চাকর। পথে পড়বে তুরস্কদের রাজ্য। সেখানকার রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্যে দুখানা গাড়ি ভর্তি সাটিন কাপড়। সেই সঙ্গে পথপ্রদর্শক হিসেবে একজন রাজকর্মচারী। আর তুরস্ক রাজাদের নামে চিঠি, যাতে হিউয়েন সাঙকে রাজকীয় অতিথির সম্মান জানানো হয়। এই চিঠিখানা খুব উপকারে লাগল হিউয়েন সাঙ-এর। তখন তুরফান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তুরস্ক সম্রাটের ছেলে তারদুশাদের দখলে। তিনি আবার এই তুরফান রাজার জামাই। সুতরাং এই দীর্ঘপথে চলতে-

হাঁটতে তাঁর আর ভয় পাওয়ার রইল না কিছুই।

তুরফান ছেড়ে তিনি প্রথমে পৌঁছলেন ও-কি-নি বা অগ্নি নামের নগরে। এখন সেই রাজ্যকে বলা হয় কারাসর। সেখানে একরাত কাটিয়ে নদী পাহাড় পার হয়ে এলেন ফুচা নামের শহরে। সেখানকার রাজার নাম স্বর্ণটেপ। সংস্কৃতে স্বর্ণদেব।

ফুচা রাজ্যটা বড় মাপের শহর। পুব থেকে পশ্চিমে এক হাজার লি। শহরের মাপ সতেরো আঠারো লি। এখানকার আবহাওয়া মিষ্টি। মিষ্টি ফলও জন্মায় প্রচুর। যেমন নাশপাতি, আলুবোখারা, আঙুর, বেদানা, পীচ। খনি আছে অনেক। কোনটা সোনার, কোনটা লোহার, কোনটা তামা, সিসে অথবা রাঙের। মাটির রঙ লাল। জোয়ার আর গম ফলে প্রচুর। দেশের মানুষরা চরিত্রবান। এখানকার লিপি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মীলিপির মতন। এখানকার বাদ্যকরেরা বাঁশি আর সেতার বাজাতে পারে চমৎকার। তিনি যখন ফুচায় পৌঁছেছিলেন তখন জোর শীত। বাধ্য হয়েই তাঁকে পুরো শীতকালটা থেকে যেতে হল ফুচায়। শীতের বরফ যেই গলতে শুরু করল, হিউয়েন সাঙ পা বাড়ালেন তিএন্শান পর্বতের দিকে। তিএন্শানের উত্তর দিকে তুষার নদ। সারা বছর ধরে তুষার জমছে, তুষার গলছে, তুষার ভাসছে, এই পর্বতের গায়ে। তুষার ভেঙে ভেঙে পড়ছে পথের উপর। তার কোনটা একশ ফুট, কোনটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু। গায়ে চামড়ার পোশাক। তবু ঠক্ঠক্ করে কাঁপার মতন শীত। শুতে হলে, ঘুমোতে হলে, ঐ বরফের উপর বিছানা পাতা ছাড়া উপায় নেই।

সাতদিন সাতরাত কেটে গেল এই ভীষণ তুষার নদ পার হতে। সঙ্গীদের মধ্যে থেকে মারা গেছে তেরো-চোদ্দজন। গরু-ঘোড়াও মরল অনেক। তারপর পৌঁছলেন গরম হ্রদের তীরে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম, ঈশিক কুল। পশ্চিম তুরস্কের সম্রাট ইয়ারগু তুঙ এই সময় শিকারে এসেছিলেন এখানে। হ্রদের ধারে টোকমাক নামে একটা শহর। সেইখানেই দেখা হল দুজনের।

সম্রাট থাকেন চামড়ার তৈরি তাঁবুতে। তাঁবুর কাপড়ে সোনালি

ফুলের কাজ। যেন নক্ষত্র ফুটে আছে তাঁবুর গায়ে। তুরস্করা অগ্নির উপাসক। তাই কাঠের আসনে বসে না কেউ। তাঁদের ধারণা কাঠের ভেতরে লুকিয়ে আছে আগুন। বসে লম্বা মাত্নর পেতে। রাজ-কর্মচারীদের পরনে জমকালো ব্রোকেডের পোশাক। সম্রাটের গায়ে সবুজ সাটিনের কোট। কপালে দশ ফুট লম্বা রেশমের কাপড়ের ফেটি। চারপাশে দুশো জন যোদ্ধা বর্শা, নিশান আর ধনুক হাতে। তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

সম্রাট হিউয়েন সাঙকে বসতে দিলেন লোহার চেয়ার। খেতে দিলেন চালের তৈরি পিঠে, দুধের সর, চিনি, মধু, মনাক্কা আর মনাক্কা থেকে তৈরি মদ। একদিন ভোজের পর বসল উপদেশ দানের আসর। হিউয়েন সাঙ বক্তা। সম্রাট আর তাঁর সৈন্যবাহিনীর লোকেরা শ্রোতা। বক্তৃতা যখন শেষ হল, সম্রাটের চোখে জল। তিনি দুহাত ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়লেন হিউয়েন সাঙের পায়ে। তারপর ঠিক তুরফান রাজার মতনই তাঁর গলাতেও একই অনুরোধ।

—ভারতবর্ষে যাবেন না। সেখানে সব সময়ই গরম। খুব কষ্ট হবে আপনার। সেখানকার মানুষেরা দেখতে কালো। সব সময়েই নগ্ন। সভ্যতা-ভব্যতা জানে না। আপনার মতন ধার্মিকের সাক্ষাৎ পাওয়ার মতন উপযুক্ত নয় ওরা।

হিউয়েন সাঙ নিজের সিদ্ধান্তে অনড়।

—ভারতবর্ষে যাবই। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মকে জানার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব। দেখব সেখানকার পবিত্র তীর্থস্থানগুলো। হাঁটব বুদ্ধের পায়ের ছোঁয়ায় ধন্য ধুলোর উপর দিয়ে।

হার মানলেন সম্রাট। হিউয়েন সাঙকে বিদায় দিতে এগিয়ে এলেন অনেকখানি পথ। সঙ্গে দিলেন একজন দোভাষী। দোভাষীর হাতে সুপারিশপত্র।

তারপর তাসখন্দ পার হয়ে সমরখন্দ। সেখান থেকে কোটিন-কোহর পর্বত আর বক্ষু নদী পার হয়ে কুন্দুজে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল তুরস্ক সম্রাটের ছেলে আর তুরফান রাজার জামাই

তারদুশাদ-এর সঙ্গে। তারদুশাদ শ্বশুরের এবং বাবার সুপারিশপত্র দেখে সাদর সংবর্ধনা জানালেন তাঁকে। বললেন,

—চলুন। আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব ভারতবর্ষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে সাধ মিটল না তাঁর। অল্পদিনের মধ্যে নিহত হলেন তিনি। হিউয়েন সাঙ যাত্রা করলেন বাল্‌খ্‌-এর দিকে। তারপর হিন্দুকুশ পর্বতমালার একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, যার নাম বামিয়ান। বামিয়ান থেকে ন' হাজার ফুট উঁচু পথ কোহিবাবা পার হয়ে গান্ধারের সমতল ভূমিতে পা পড়ল তাঁর। বলতে গেলে এই প্রথম তাঁর পা পড়ল ভারতবর্ষের মাটিতে। হিন্দুকুশ হল 'হিন্দুর দেশ'। অন্য নাম 'ব্রাহ্মণদের দেশ'।

গান্ধারের রাজধানী তখন কাপিশী। গান্ধারের রাজারা যদিও হূন বংশের, তবু ভারতবর্ষের জল-মাটির গুণে হূনেরা বদলে গেছে অনেক। এখন যিনি রাজা, তিনি বৌদ্ধ। এখানে এসেই হিউয়েন সাঙ প্রথম দেখতে পেলেন জৈন আর শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের। গায়ে ছাই মাখা। গলায় হাড়ের মালা। সারা গায়ে কোনো আবরণ নেই। এখানে তিনি থাকতেন এক হীনযানী সঙ্ঘারামে। কণিষ্কের আমলে এই সঙ্ঘারাম ছিল একটা বন্দীশালা। যে-সব রাজাকে যুদ্ধে হারাতেন তিনি, তাদের রাজপুত্রদের এনে এখানে বন্দী করে রাখতেন জামিন হিসাবে। ফলে লোকের মনে ধারণা ছিল, এই সঙ্ঘারামের মাটির তলায় নিশ্চয়ই রয়েছে গুপ্তধন। একবার তো সত্যি সত্যিই শুরু হয়ে গেল খোঁড়াখুঁড়ি। হিউয়েন সাঙও যোগ দিলেন তাতে।

এখান থেকে পা বাড়ালেন নগরহারের দিকে। এখন যেটা জালালাবাদ। নগরহার থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে ছিল একটা গুহা। আসা-যাওয়ার পথটা ছিল দুর্গম। তার উপরে নৃশংস দস্যুদের উৎপাত। সেই গুহার গায়ে বুদ্ধ নাকি রেখে গিয়েছেন নিজের ছায়া। খবরটা কানে আসতেই তিনি জেদ ধরলেন, যাবেন। স্থানীয় সঙ্গীরা বাধা দিল। যাবেন না, প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ যাওয়ার ভয়। হিউয়েন সাঙ উত্তরে বললেন,

—লক্ষ কল্পেও একবার বুদ্ধের ছায়ার দর্শন মেলে কি মেলে না। এত কাছে এসে আমি কখনো না দেখে থাকতে পারি?

পথের মাঝখানে সত্যিই পড়লেন একদল দস্যুর হাতে। কিন্তু হিউয়েন সাঙের সরল ব্যবহার আর তীর্থযাত্রীর পোশাক দেখে দস্যুরা তাঁকে ছেড়ে দিল। গুহায় ঢুকলেন তিনি। ঘন অন্ধকার। এক বিন্দু আলো নেই কোনখানে। বুদ্ধের ছায়াটা ফোটে গুহার পুব দিকের দেয়ালে। সেইদিকে মুখ করে প্রণাম করলেন একশবার। কিন্তু ছায়া কই? শুধু তো সেই অন্ধকার। তাহলে কি আমি পাপী? আমি অজ্ঞানী? এই বেদনায় কাঁদতে লাগলেন তিনি। আর আবৃত্তি করতে লাগলেন বৌদ্ধ গাথা আর সূত্র।

সেই সময়েই ঘটল অলৌকিক ঘটনা। পুবের দেয়ালে দেখা দিল এক ঝলক আলোর আভা। সামান্য, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের মতন। এইটুকু দেখে মনের আশা মিটল না। আবার শুরু করলেন আরাধনা। ওদিকে আভাও বাড়ছে। আর তারপর সত্যিই হিউয়েন সাঙের বুকে শাঁখের মতন বেজে উঠল এক পরম আনন্দ। ঐ তো তাঁর সামনে বুদ্ধ। ঐ তো সেই করুণাঘন মূর্তি। সেই দিব্য দেবতা। তাঁর মনের মধ্যে বেজে চলল আরতির ঘণ্টা, আমি ধন্য, আমি ধন্য, আমি ধন্য।

নগরহার ছেড়ে খাইবারপাশের ভিতর দিয়ে তিনি এলেন পুরুষপুরে। যা এখন পেশোয়ার। এক সময় এই পুরুষপুর ছিল কণিষ্কের শীতকালের রাজধানী। হিউয়েন সাঙ-এর সময়ে পুরুষপুরে না ছিল ঐশ্বর্য, না ছিল জীবনের সাড়া। কোনমতে হাজার খানেক পরিবার টিকে আছে শহরের এক কোণে। মিহিরগুল অথবা মিহির কুলের আক্রমণে দেশটা তখন একটা ধ্বংসস্তূপ। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ মঠ ভেঙে-চুরে মাটিতে লুটোনো। গাছ গজিয়ে গেছে তাদের গায়ে। মিহিরকুল ছিলেন বর্বর তাতার হূনদের বংশধর।

এই পুরুষপুরে একটা নতুন জিনিসের স্বাদ পেয়েছিলেন হিউয়েন সাঙ। সেটা হল আখের গুড়। আখ থেকে এভাবে মিষ্টি রস

বানানো যায়, চীনের মানুষ তা জানত না। ভ্রমণকারীদের মুখ থেকে এই কাহিনী শুনে চীন সম্রাট থাই চুঙ ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছিলেন শিখবার জন্যে। এরপর চীন তরল গুড় থেকে বানাতে শিখে গেল শুকনো চিনি। কয়েক শ বছর পরে এমন হল যে, চীন থেকেই ভারতবর্ষে আসতে লাগল চিনি। চিনি নামটাও সেই কারণে।

পুরুষপুর থেকে তক্ষশীলা। এখানেও সেই হূণ অত্যাচারের একই দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। তক্ষশীলা থেকে পা বাড়ালেন কাশ্মীরে। কাশ্মীরের রাজা তখন দুর্লভ বর্মন প্রজ্ঞাদিত্য। হিউয়েন সাঙ প্রবর-পুরে অর্থাৎ এখনকার শ্রীনগরে পৌঁছে গেছেন খবর পেয়েই তিনি রাজ-সিংহাসন ছেড়ে নগরদ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন বিদেশী অতিথিকে বরণ করতে। সঙ্গে সভাসদ্ আর রাজধানীর ভিক্ষুরা। সব মিলিয়ে প্রায় হাজারজন মানুষ। প্রণাম করেই তাঁর পায়ে ফুল ছড়ানো হল চতুর্দিক থেকে। মস্ত একটা হাতি। হাতির গায়ে ঝলমলে সাজসজ্জা। সেই হাতির পিঠে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হল রাজধানীতে। পথের দুধারে উড়ছে রঙিন পতাকা। জ্বলছে ধূপ ধুনো। ফুলের গয়না পরে সেজেছে শহরের পথ-ঘাট। বাতাসে উড়ছে চামর। 'জয়েন্দ্র' নামের এক বিহারে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল তাঁর।

পরের দিন রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ। রাজ্যের যত পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেই ভোজে। ভোজসভার পর শাস্ত্র আলোচনা। রাজা যখন শুনলেন, তিনি এসেছেন শাস্ত্র আর সূত্রের অনুলিপি করার অভিপ্রায়ে, সঙ্গে সঙ্গে কুড়িজন লিপিকার জোগাড় করে দিলেন তিনি। আর পাঁচজন ভৃত্য রইল তাঁকে দেখাশোনার জন্যে।

কাশ্মীরে তিনি দেখেছেন, প্রচুর ফুল, ফল, ফসল। দেখেছেন অনেক ওষুধের গাছ, জাফরান আর স্ফটিক। দেখেছেন তাজা পাহাড়ি ঘোড়া। শীতকালে প্রবল তুষারপাত। মানুষজনেরা দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু অসৎ আর চালাক। অথচ তারা লেখাপড়ায় অনুরাগী। বৌদ্ধও দেখেছেন, বিধর্মীও দেখেছেন।

কাশ্মীর ছেড়ে গঙ্গাতীরের দিকে পা। পার হলেন শাকোল, যা এখনকার শিয়ালকোট।

ইরাবতীর তীরে লাহোর। সেইখানে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। বয়স, সাতশ বছর। পুরো একটা মাস রয়ে গেলেন সেই ধার্মিকের কাছে, যতটুকু শেখা যায়, শিখে নিলেন। তারপর বিপাশা নদীর তীরে চীনভুক্তি নামের একটা জায়গায় এসে রয়ে গেলেন চোদ্দ মাস। একজন গুরু পেয়েছিলেন এখানে। নাম বিনীতপ্রভ। সেই সময়ে এসে গেল বর্ষাকাল। বৌদ্ধর ভিক্ষুদের নিয়ম হল, বর্ষাকালে না ঘোরা, না বেড়ানো। থাকতে হবে সঙ্ঘারামে। বর্ষাকালটা জলন্ধরে কাটিয়ে এরপর তিনি বেড়াতে গেলেন কুলুট পর্বতে। এখন যার নাম কুলু-ভ্যালি। সেখান থেকে মথুরা। মথুরা এখন বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু সে-সময়ে এটা ছিল বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান। সম্রাট অশোকের গুরু মহাস্থবির উপগুপ্ত ছিলেন এই মথুরারই মানুষ। তাঁর নখ আর কেশর রাখা ছিল এখানকার এক বিহারে। তিনি দেখেছিলেন মথুরার মানুষ আমলকীর বাগান বানাতে ভালবাসে।

মথুরা ছেড়ে স্থানীশ্বর অর্থাৎ থানেশ্বরে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকর বর্ধনের রাজধানী ছিল এক সময়ে। থানেশ্বরের আবহাওয়া কিছুটা গরম হলেও, আরামের। এখানকার বেশির ভাগ বাসিন্দাই ধনী এবং অলস। তবে গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

থানেশ্বর থেকে নানা জায়গা দেখে-শুনে, ঘুরে-বেড়িয়ে পৌঁছলেন কান্যকুব্জে। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের রাজধানী এটা। হর্ষবর্ধন তখন রাজধানীতে ছিলেন না। তাই দেখা হল না। তিনি এখানে রয়ে গেলেন তিনমাস, ভদ্র-বিহার নামের এক মঠে। আচার্য বীর্যসেন-এর কাছ থেকে ত্রিপিটকের পাঠ নেবার জন্যে।

কান্যকুব্জ নগর সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা—

লম্বায় এর পরিধি ২০ লি। চওড়ায় ৪।৫ লি। নগরের চারদিক শুকনো পরিখা দিয়ে ঘেরা। জায়গায় জায়গায় উঁচু স্তম্ভ। আয়নার

মতো স্বচ্ছ জল পুকুরে। ফলের বাগান, ফুলের বাগান পথে-ঘাটে। খাওয়া-দাওয়ার জিনিসিপত্র প্রচুর। মানুষেরা ধনী আর সুখী। পোশাক-আশাক দামি আর উজ্জ্বল। সরল স্বভাব সকলের। লেখাপড়ার চর্চা ঘরে ঘরে। একশর মতন সজ্ঘারাম আছে শহরে। সেখানে থাকে দশহাজার ভিক্ষু, হীনযান-মহাযান মিলিয়ে।

হর্ষবর্ধন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমরা তাঁর বিবরণ থেকে।

কর্ণস্থবর্ণের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্কের ছলনায় মৃত্যু হয় হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধনের। সভায় নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁর মন্ত্রীরা হত্যা করে তাঁকে। হর্ষবর্ধনের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। বলতে গেলে কিশোর, নাবালক। কিন্তু বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, অন্যান্য রাজকীয় গুণে সেই বালক-বয়সেই তিনি পরিণত। তাই দেখে জোর করে হর্ষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ভাণ্ডী আর অন্যান্য রাজকর্মচারী তাঁর হাতেই তুলে দিলেন রাজ্যের ভার। সিংহাসনে বসে তিনি নিলেন নতুন নাম, কুমার শিলাদিত্য। তিরিশ বছর মেতে রইলেন যুদ্ধে। পুব-পশ্চিমের সমস্ত দেশ যখন জয় করা হয়ে গেল, যখন দেখলেন তাঁর শত্রু রাজ্যের রাজারা শিলাদিত্য নাম শুনলেই কেঁপে ওঠে ভয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাতের অস্ত্র। তারপর থেকেই তাঁর কাজ হল, বৃক্ষরোপণ, জীবহত্যা নিষিদ্ধ করা, সমস্ত ধর্মের লোককে শ্রদ্ধা জানান, দেশের দরিদ্র মানুষের জন্যে চিকিৎসা, ওষুধ আর আহারের ব্যবস্থা করা আর দান-ধ্যান। নিজে শৈব। কিন্তু বিদ্বেষ নেই কোনো ধর্মে। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে প্রখর নজর। নিজে ছিলেন বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান। নাটক লিখেছেন তিনখানা। রত্নাবলী, নাগানন্দ আর প্রিয়দর্শিকা। নিজের রাজসভার প্রিয় কবির নাম বানভট্ট। তাঁর লেখা কাদম্বরী একটা বিখ্যাত রচনা। ভায়ের নাম রাজ্যবর্ধন। বোনের নাম রাজশ্রী। প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে মহামোক্ষ-পরিষদ ডাকতেন তিনি। শুধু সৈন্যদের খরচটুকু থাকত রাজকোষে। বাকি সমস্ত টাকা দান করতেন ঐ

সময়ে, তিন মাস ধরে। ঐ রকম একবারের সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন হিউয়েন সাঙ। সে কাহিনী পরে।

কান্যকুব্জ থেকে আবার শুরু হল পথ পর্যটন। গঙ্গা পার হয়ে পৌঁছলেন অযোধ্যা। অযোধ্যা ছেড়ে যখন কুড়ি জন সঙ্গী নিয়ে গঙ্গা পার হচ্ছেন প্রয়াগে যাবেন বলে, সেই সময় ঘটেছিল একটা সাংঘাতিক ঘটনা। জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হলেন তাঁরা। এর আগেও দস্যুদের হাতে পড়েছেন অনেকবার। কিন্তু এবারের দস্যুরা অনেক বেশি হিংস্র। গঙ্গার ধারে অশোক গাছের গভীর বনের আড়ালে লুকিয়েছিল দশটা নৌকো নিয়ে। চারদিক থেকে হিউয়েন সাঙের নৌকোটাকে ঘিরে ফেলল তারা। অনেক যাত্রী প্রাণের ভয়ে ঝাঁপ দিল জলে। অন্য যাত্রীদের ডাঙায় টেনে নিয়ে গেল দস্যুরা। কেড়ে নিল তাদের জামা-কাপড়, জিনিস-পত্র। তারপর তারা ঘিরে রইল হিউয়েন সাঙকে। দস্যুরা দেবী দুর্গার উপাসক। সময়টা ছিল শরৎকাল। তারা খুঁজছিল একজন সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষ, যাকে বলিদান দেওয়া যেতে পারে দেবীর পায়ে। হিউয়েন সাঙকে পেয়ে মনের খুশিতে ডগমগ। এই তো সেই মানুষ, যাকে তারা খুঁজছিল। বলি বন্ধ ছিল অনেকদিন। এবার দেওয়া যাবে জমিয়ে-জাঁকিয়ে, বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে। হিউয়েন সাঙ বললেন,

—আমার এই সামান্য শরীর নিয়ে যদি তোমাদের কাজ হয়, হোক। আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এসেছি অনেক দূরের দেশ থেকে, শাস্ত্র-গ্রন্থ জোগাড় করতে। এই সময়ে তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমাদের দুর্গতি ঘটতে পারে।

দস্যুরা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিল সে কথা। তাঁকে টেনে নিয়ে গেল অশোকবনের মাঝখানে। দলপতি হুকুম দিল বলিদানের বেদি বানাতে। শান পড়ল খড়্গে। হিউয়েন সাঙ বুঝলেন, মৃত্যু একেবারে শিয়রে। তিনি দস্যু সর্দারকে বললেন,

—আমাকে একটু সময় দাও। আমি শান্ত মনে যেতে চাই। আমার দেবতাকে ধ্যান করে নেব।

বসলেন ধ্যানে।

আর ঠিক সেই সময়েই ঘটল একটা অঘটন। পৃথিবী কাঁপিয়ে উঠল ঝড়। মড়মড় করে ভেঙে পড়তে লাগল গাছপালা। নদীতে ফণা তুলল ঢেউ। নদীতীরে ছুটতে লাগল বালির ঝাপটা। শকুনের ডানার মতন অন্ধকার নেমে এসে ছেয়ে ফেলল যেখানে যতটুকু আলো। দিন হয়ে গেল ঘোর আঁধারের রাত যেন। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল দস্যুরা। বুঝতে পারল এ হল বন্দী তীর্থযাত্রীর তপস্যার ফল। দস্যুরা গিয়ে আছড়ে পড়ল হিউয়েন সাঙের পায়ে।

হিউয়েন সাঙ বললেন,

—তোমরা এই জঘন্য ব্যবসা ত্যাগ কর।

তারা তখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের অস্ত্রশস্ত্র গঙ্গার জলে। ঝড় থামল। মেঘ কাটল। রোদ হাসল পৃথিবীর উপরে।

হিউয়েন সাঙ নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলেন প্রয়াগে। গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী এই তিন নদী মিলেছে যেখানে।

তিনি দেখেছেন, এদেশের মানুষের অগাধ বিশ্বাস এই সঙ্গম সম্বন্ধে। এখানে স্নান করলে ধুয়ে যায় জীবনের সব কিছু পাপ। হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে আসে এখানে। সাতদিন ধরে উপোস করে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় মারা যায় জলে ডুবে। তিনি দেখেছেন, শুধু মানুষ নয়, বানর আর হরিণও হাজির হয় ঝাঁকে ঝাঁকে। স্নান করে তারাও।

প্রয়াগ ছেড়ে তিনি পৌঁছলেন কৌশাম্বীতে। গুপ্ত সম্রাটদের আরেকটা রাজধানী এটা। কৌশাম্বীর পর শ্রাবস্তীপুর। বুদ্ধ ভক্ত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী। শ্রাবস্তীপুর থেকে এক ক্রোশ দূরে জেতবন। এখানে এসে তিনি শুনলেন বুদ্ধের সম্পর্কে অনেক কাহিনী। সুদত্ত ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠী। অকাতর দান-ধ্যানের জন্যে তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন, অনাথপিণ্ডদ। একবার তাঁর মনে সাধ জাগল, বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের জন্যে বানিয়ে দেবেন একটা বিহার। বুদ্ধের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন এই প্রস্তাব। বুদ্ধ

শিষ্য সারিপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে বেরুলেন মনের মতন জায়গা। নগরের বাইরে ছিল রাজকুমার জেতের বাগান। বুদ্ধ পছন্দ করলেন সেই জায়গাটাই। সুদত্ত ছুটলেন রাজকুমারের কাছে। রাজকুমার হেসে বললেন,

—বেশ তো। বাগানটা বেচতে পারি ঠিক মতন দাম মিললে।

—কত দাম ?

—যতগুলো স্বর্ণমুদ্রা বিছোলে বাগানটা ভরে যাবে, সেটাই হবে এর দাম।

সুদত্ত রাজি হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। তৈরি হয়ে গেল বিহার। বুদ্ধ ভালবাসতেন এই বিহারকে। এখানে বসেই তিনি শিষ্যদের দিয়েছিলেন সবচেয়ে মূল্যবান উপদেশ, যা ত্রিপিটকে লেখা আছে।

বুদ্ধকে নিয়ে দ্বিতীয় কাহিনী।

বুদ্ধ তখন 'অনবলুপ্ত' নামের হ্রদের তীরে উপদেশ দিচ্ছেন শিষ্যদের। হঠাৎ চোখে পড়ল সারিপুত্র ,অনুপস্থিত। শিষ্য মৌদ্‌গল্যায়নকে বললেন, সারিপুত্রকে খুঁজে আনো এখুনি।

সারিপুত্র ছিলেন বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানবলের জন্যে বিখ্যাত। আর মৌদ্‌গল্যায়ন যোগবলের জন্যে। এক মুহূর্তে মৌদ্‌গল্যায়ন পৌঁছে গেলেন সারিপুত্রের কাছে। সারিপুত্র তখন জেতবন বিহারে বসে সেলাই করছিলেন নিজের ছেঁড়া কাপড়। মৌদ্‌গল্যায়ন জানালেন, এখুনি তোমাকে যেতে হবে অনবলুপ্তে।

—একটু অপেক্ষা করো। হাতের কাজটা সেরে নিই।

সারিপুত্রের উত্তর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মৌদ্‌গল্যায়ন।

—এখুনি যদি না ওঠো যোগবলে আমি তোমাকে তোমার বাড়িসুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যাব।

সারিপুত্র মনে মনে হাসলেন মৃদু মৃদু। গায়ের চাদরটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন,

—বাড়িসুদ্ধু নাড়াতে হবে না। যদি এই চাদরটাকে নাড়াতে পার, আমি এখুনি উঠে পড়ব।

মৌদ্‌গল্যায়ন কাজে লাগালেন নিজের যোগবল। পৃথিবী কাঁপিয়ে উঠল ঝড়। ভূমিকম্পের মতন কেঁপে উঠল পৃথিবী। কিন্তু সারিপুত্রের চাদর নড়ল না এতটুকু। মৌদ্‌গল্যায়ন মনের দুঃখে ফিরে এলেন বুদ্ধের কাছে। এসে দেখেন সারিপুত্র পৌঁছে গেছেন আগেই। বুদ্ধের পাশে বসে লজ্জায় তখন মৌদ্‌গল্যায়নের চোখ-মুখ রাঙা। তিনি বললেন,

—এবার বুঝলাম যে, যোগবলের চেয়ে জ্ঞানবল অনেক বড়।

হিউয়েন সাঙ জেতবন বিহারে ঠিক সেইখানে দেখেছিলেন একটা স্মারকস্তূপ, সারিপুত্র সেলাই করেছিলেন যেখানে বসে। দেখেছিলেন তিনটে গর্ত, তিনজন অপরাধী সশরীরে রসাতলে গিয়েছিলেন যেখানে। প্রথমটা দেবদত্তের। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধকে হত্যার। ভিক্ষু কোকালিক নিন্দা রটনা করেছিলেন বুদ্ধের নামে। ব্রাহ্মণের মেয়ে চণ্ডমনা মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়েছিলেন বুদ্ধের চরিত্রে। দেখেছিলেন আরও একটা স্মারকস্তূপ, দস্যু অঙ্গুলীমালার নামে। মানুষকে হত্যা করে, তাদের আঙুল কেটে, সেই আঙুলকে মালার মতন করে পরতেন বলে নাম হয়েছিল অঙ্গুলীমালা। পরে এই দস্যু বদলে গিয়ে ভিক্ষু হয়েছিল, বুদ্ধের উপদেশ শুনে।

শ্রাবস্তীপুর পার হয়ে কপিলাবস্তু। বুদ্ধের জন্মস্থান। কিন্তু হিউয়েন সাঙ যখন পৌঁছলেন, তখন সে নগর যেন রাক্ষসের দাঁতে চিবোনো হাড় কংকাল। না আছে মানুষ। না আছে প্রাণের সাড়া। যেদিকে তাকানো যায় শুধু ধ্বংসস্তূপ। রাজপ্রাসাদের সামান্য কিছু ধ্বংসাবশেষ টিকে ছিলো তখনও। হিউয়েন সাঙ দেখতে পেলেন বুদ্ধজননী মায়াদেবীর ঘর, বুদ্ধের বাল্যকালের অনেক স্মারক। দেখলেন লুম্বিনী উদ্যান, যেখানে জন্মেছিলেন বুদ্ধ। সম্রাট অশোক সেখানে বানিয়ে দিয়েছিলেন স্তম্ভ।

কপিলাবস্তু থেকে বারাণসী।

বারাণসীর মন্দিরগুলো অনেক উঁচু। তাদের সারা গায়ে ভাস্কর্য। মন্দিরের যে অংশগুলো কাঠ দিয়ে বানানো, সেখানে কাঠের গায়ে

নানান রকম চকচকে রঙ মাখানো। মন্দিরগুলোর চারদিকে সবুজ জলের পুকুর আর রঙিন ফুলের বাগান। সাধু-সন্ন্যাসীতে বারাণসী বোঝাই। কেউ ন্যাড়া। কেউ জটাধারী। কেউ নগ্ন। একটা মন্দিরে তিনি দেখতে পেলেন একশ ফুট উঁচু এক শিবমূর্তি। তামা দিয়ে তৈরি। তিনি লিখেছেন, দেখলে মনে হয় যেন জীয়ন্ত দেবতা। একই সঙ্গে ভয় এবং ভক্তিতে ভরে ওঠে মন!

সারনাথ অথবা মৃগদাবতে গিয়ে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন তিনি। বোধিলাভ করার পর বুদ্ধ তাঁর প্রিয় পাঁচজন শিষ্যের কাছে বাণী প্রচার করেছিলেন এইখানে বসেই। মৃগদাবতে ছিল প্রকাণ্ড একটা মঠ। ভিক্ষু থাকত প্রায় পনেরো হাজার। সে মঠের বারান্দা ছিল ধ্যানের পক্ষে খুব উপযুক্ত। হিউয়েন সাঙ দেখেছেন সেই পুকুর, যেখানে স্নান করতেন, কাপড় কাচতেন, ভিক্ষাপাত্র মাজতেন বুদ্ধ।

এখান থেকেই পাটলিপুত্রে। পাটলিপুত্রেরও তখন ক্ষতবিক্ষত চেহারা। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, অথবা অন্যান্য গুপ্ত সম্রাটদের সময় যে জেল্লা-জৌলুষ, যে জাঁকজমক, যে ঝলমলানি, কিছুই নেই তার। তবুও সেই ভাঙা-চোরা রাজপ্রাসাদ দেখেই মুগ্ধ। তাঁর মনে হয়েছিল অশোকের রাজপ্রাসাদ মানুষের হাতে গড়া নয়। কোনো দৈত্য-দানবের তৈরি।

গঙ্গাতীরে তিনি দেখতে পেলেন একটা পাথরের উপরে বুদ্ধের পায়ের ছাপ। মগধ থেকে চির-বিদায় নেবার সময় দাঁড়িয়েছিলেন এই পাথরের উপরে পা রেখে।

সম্রাট অশোক সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন হিউয়েন সাঙ। যখন তিনি প্রথম সিংহাসনে বসলেন রাজা হয়ে, তখন ছিলেন প্রবল অত্যাচারী। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে তিনি তৈরি করেছিলেন একটা নরক। একটা গভীর গর্তের ভিতরে জ্বলছে প্রকাণ্ড চুল্লি। সব সময়েই টগবগ করে ফুটছে গলিত ধাতু। প্রথম দিকে শুধু অপরাধীদেরই ফেলে দেওয়া হত ঐ চুল্লিতে। পরে

এনম হয়ে দাঁড়াল, নরকের পাশ দিয়ে যে যায় তাকেই ফেলে দেওয়া হয় চুল্লিতে।

একবার ঘটে গেল এক অদ্ভুত ব্যাপার। এক শ্রমণ যাচ্ছিলেন রাজপথ দিয়ে ভিক্ষে করতে করতে। নরকের কাছাকাছি আসতেই নরকের রক্ষী তাঁকে নিয়ে এল চুল্লিতে চাপাবে বলে। শ্রমণ বললেন,

—আমাকে একটু সময় দাও, ধ্যানের জন্যে।

ধ্যান শেষ হবার পর রক্ষী যখন তাঁকে ফুটন্ত চুল্লির উপর ফেলে দিলে, শ্রমণের মনে হল তিনি যেন স্নান করতে নেমেছেন শীতল জলের দিঘিতে। আর সত্যি সত্যিই, দিঘির জলে যেমন পদ্ম ফুটে থাকে, সেই রকম একটা ফোটা পদ্ম ফুটে উঠল গলিত ধাতুর ভিতর থেকে শ্রমণের পায়ের তলায়। রক্ষী তো দেখেই অবাক। শ্রমণ নিশ্চিন্তমনে বসে আছেন ফোটা পদ্মটির উপর চোখ বুজিয়ে।

এই অলৌকিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। খবর গিয়ে পৌঁছল সম্রাট অশোকের কানেও। তিনিও ছুটে এলেন দেখতে। সম্রাট যেই নরকের সীমানায় ঢুকেছেন অমনি রক্ষী বললে,

—মহারাজ, এবার আপনাকেও মরতে হবে ঐ চুল্লিতে।

—কেন ?

—মহারাজ, আপনার হুকুম ছিল, যে এই নরকের মধ্যে আসবে, তারই মৃত্যু। আপনি এলে যে নিস্তার পাবেন, এমন কথা তো ছিল না।

সম্রাটের দু চোখে জ্বলে উঠল দু-রকমের আগুন। একটা অপমানের জ্বালা থেকে। আরেকটা অবিচারের জ্বালা থেকে। তিনি বললেন,

—তাহলে তুমিই বা অব্যাহতি পাবে কেমন করে ? অনেক নরহত্যা করেও তোমার সাধ মেটেনি। এখন মিটবে।

সম্রাটের হুকুমে রক্ষীকে ছুঁড়ে ফেলা হল ফুটন্ত কড়াইয়ে। একটা বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে অবসান ঘটল একটা বীভৎস প্রথার। বুজিয়ে দেওয়া হল সেই নরককুণ্ড।

হিউয়েন সাঙ দেখেছেন সেই নরককুণ্ডের পাশে একটা স্মারক স্তম্ভ। নরকটা বুজিয়ে ফেলার পরই নাকি ভিক্ষু উপগুপ্তের সঙ্গে দেখা হয় অশোকের। আর তারপরই তাঁর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা।

হিউয়েন সাঙ এবার পা বাড়ালেন বুদ্ধগয়ার দিকে। দেখলেন বোধিদ্রুম আর বজ্রাসন। দেখলেন সেই পুকুর যা দেবরাজ ইন্দ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের কাপড় ধোয়ার জন্যে। দেখলেন আরও একটা পুকুর যাতে বাস করতেন নাগরাজ মুচিলিন্দ। বুদ্ধের মাথায় সাতটা ফণা ধরে থাকতেন যিনি রাজছত্রের মতন। দেখলেন সেই কুটির, বোধিলাভের আগে যার ভিতরে বসে তপস্যায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

হিউয়েন সাঙ বুদ্ধগয়ায় ছিলেন আট-ন'দিন। রোজই পুজো দিয়েছেন, এক একটা পুণ্য স্থানে।

গয়া থেকে এবার পৌঁছলেন স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ নালন্দায়।

নালন্দা হল মানুষের বিরতিহীন দানে গড়ে ওঠা একটা বৌদ্ধমঠ। প্রাচীন মানুষের মুখ থেকে শোনা গেছে অনেক কিংবদন্তি। এই মঠের দক্ষিণে একসময় ছিল একটা আমবাগান। সেই আমবাগানের মাঝখানে, গাছের ঘন ছায়ার নিচে একটা পুকুর। সেখানে বাস করত এক নাগ। নাম নালন্দা। যখন ঐ পুকুরের পাড়ে প্রথম তৈরি হল মঠ, তারও নাম দেওয়া হল নালন্দা। অন্য কিংবদন্তি হল, বোধিসত্ব একসময় তাঁর রাজধানী গড়েছিলেন এখানে। দীন-দরিদ্র মানুষের বেদনা ব্যাধের তীরের বিষ-মাখানো ফলার মতন বিঁধেছিল তাঁর বুকে। রাজত্বকে মনে হয়েছিল ধুলোর মতন তুচ্ছ। মানুষের কল্যাণের জন্যে একদিন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

কেউ বলেন আম্র অথবা অমর নামে একজন শ্রেষ্ঠীর দখলে ছিল এই জায়গাটা। ৫০০ জন ব্যবসায়ী মিলে সেই শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নিয়েছিলেন তাঁরা ১০ লক্ষ সোনার মুদ্রা দিয়ে। তারপর জায়গাটা দান করে দিয়েছিলেন বুদ্ধের পায়ে। বুদ্ধ তিনমাস ধরে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন এখানে। বুদ্ধ নির্বাণ

লাভ করলেন। শক্রাদিত্য নামে এক বৃদ্ধ রাজা, বুদ্ধের প্রতি তাঁর মনের শ্রদ্ধা আর আত্মার প্রণাম নিবেদনের জন্যে গড়ে দিলেন একটা মঠ। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বুদ্ধগুপ্ত ঐ মঠের দক্ষিণ দিকে গড়ে-দিলেন আরও একটা মঠ। বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে তথাগত আরও একটা গড়ে দিলেন পূর্ব দিকে। তাঁর ছেলে বালাদিত্য গড়লেন উত্তর-পূর্ব কোণে। এই সময় নাকি চীন দেশ থেকে একদল ভ্রমণকারী এসেছিল বৌদ্ধধর্মের কথা শুনতে, মর্ম জানতে। তাঁদের দেখে বালাদিত্যের মনে সে কী আনন্দ! এরপর মঠের সাধু-সন্ন্যাসীদের সব দান করে দিয়ে তিনি নিজেই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন কোথায়।

তাঁর ছেলে বজ্র। বজ্র এবার আরও একটা মঠ গড়ে দিলেন উত্তর দিকে। ওদিকে মধ্য-ভারতের এক রাজাও, বুদ্ধকে তাঁর প্রণতি জানাতে গড়ে দিলেন আরও একটা মঠ।

এই সমস্ত মঠ বা সঙ্ঘারামকে ঘিরে ছিল উঁচু ইটের প্রাচীর। ভিতরে ঢুকতে হয় একটা তোরণ দিয়ে। প্রধান তোরণ দিয়ে পৌঁছতে হয় এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সৌধে। এর থেকে ভাগ হয়ে গেছে আটটা সৌধ। অর্থাৎ আটটা সভাগৃহ। পাহাড়ের চুড়োর মতন সৌধের মাথা। প্রত্যেকটা স্তম্ভের গায়ে অপূর্ব সব কারুকার্য। পর্যবেক্ষণশালা বা মানমন্দিরের চুড়োটা যেমন স্বপ্নের মতন দেখতে, তেমনি যেন পৌঁছে গেছে এক স্বপ্নের দেশে। মাঝে মাঝে আকাশের কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যায় তার সবচেয়ে উপরের ঘরটা। তার জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশের মেঘের খেলা। দেখা যায় চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ।

সরোবরে সরোবরে স্বচ্ছ সবুজ জল। উপরে ভাসছে নীল পদ্ম। সরোবরের পাড়ে পাড়ে স্তবকে স্তবকে রক্ত রঙের কনকফুল। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন ভরা ফুলের সাজি হাতে নিয়ে। চারদিকে আমের বাগান, আলোয়-ছায়ায় কোথাও চিকণ সবুজ, কোথাও কালচে সবুজ।

প্রত্যেক সজ্ঘারামের প্রাঙ্গণ ঘিরে ভিক্ষুদের থাকার ঘর। ঘর-গুলো চারতলা। প্রত্যেক তলার রঙিন কার্নিসে খোদাই-এর কাজ। থামগুলোর রঙ লাল। তার উপরে কারুকার্য। বারান্দায় বারান্দায় খোদাই করা রঙিন ঝালর। ঘরের ছাদ রঙিন টালি দিয়ে ছাওয়া। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে তাদের গায়ে লেগে।

নালন্দায় সব কিছু নিয়মের ছন্দে বাঁধা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শৃঙ্খলায় গাঁথা সকলের কাজ। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি একটা জল-ঘড়িতে প্রত্যেক পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর শব্দ হয়, সময়-নির্দেশের। সেই শব্দের সঙ্গে বেজে ওঠে তূর্য। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আর শিক্ষক সকলেই লেগে যান যার-যার কাজে। মঠের নিয়ম-কানুন কঠোর। সকলকেই মেনে চলতে হয় সে-সব। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলেছে শাস্ত্র পাঠ আর ধর্মের আলোচনা। বয়সের ভেদ নেই। বৃদ্ধ এবং যুবক একই সঙ্গে আলোচনায়, তর্কে, বিচারে ব্যস্ত। কেউ যদি ত্রিপিটক সম্পর্কে বিচার করতে না পারে, লুকিয়ে থাকে লজ্জায়। বিদেশের পণ্ডিতরা এখানে আসেন নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের সন্দেহ দূর করতে। আবার এমনও ঘটে যে, নিজেদের মিথ্যা করে পরিচয় দেন কেউ কেউ, নালন্দার ছাত্র বলে। কেননা নালন্দার ছাত্র মানেই দেশের সম্মানীয় জ্ঞানী। ছাত্রদের এখানে ঢুকতে হয় পরীক্ষা দিয়ে। কঠিন সব প্রশ্ন করে দ্বারপাল। উত্তর দিতে না পারলে, তারা নিজেরাই চলে যায় মাথা নিচু করে। শতকরা ৮০।৯০ জনই উত্তর দিতে পারে না।

নালন্দায় বিদ্যার্থীর সংখ্যা দশহাজার। আচার্যের সংখ্যা শতাধিক। পাঠ নেবার জন্যে একশোটা ঘর। রাজার দান-করা একশোটা গ্রামের খাজনা থেকে খরচ চলে এখানকার। এছাড়া আছে রাজা-রাজড়া, ধনী-শ্রেষ্ঠীদের দান। ঐ একশোটা গ্রামের গৃহস্থরা পাঠিয়ে দেয় কয়েক শ'মণ চাল, কয়েক শ' মণ ঘি আর দুধ। বেতন দিতে হয় না কোনো ছাত্রকে। বিনা পয়সাতেই তাদের থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড়, অসুখ-বিসুখের ওষুধ।

হিউয়েন সাঙ যখন নালন্দায় এসেছিলেন, তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। বাঙালী। সমতট রাজপরিবারের ছেলে। তাঁর সময়ে ছাত্রদের শুধু বৌদ্ধধর্মের বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হত না। বেদ-বেদান্ত, হিন্দু-দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, চিকিৎসা সব কিছুই ছিল পাঠ্যের তালিকায়। পড়াশুনার সঙ্গে ব্যায়াম। ব্যায়াম মানে দীর্ঘ পথ হাঁটা, মঠের বা আশ্রমের কাজ, বাগান করা।

নালন্দায় তখন এমন হাজার জন ছিলেন যাঁরা সংগ্রহ করা মোট শাস্ত্রের মাত্র কুড়িটার ব্যাখ্যা করতে পারতেন। পাঁচশজন ছিলেন যাঁরা পারতেন তিরিশটার। দশজন পারতেন মোট পঞ্চাশটার। কেবলমাত্র অধ্যক্ষ শীলভদ্রই পারতের সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে। শীলভদ্রের বয়স তখন ১০৬ বছর।

নালন্দার প্রাকারের ভিতরের সৌধ, আশ্রম এসব ছাড়াও ছিল অনেকগুলো বিহার আর স্তূপ। বিভিন্ন রাজা গড়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে। একটা বিহার ছিল ৩০০ ফুট উঁচু। সেটা বালাদিত্যের গড়া। রাজা পুণ্যবর্মা তৈরি করে দিয়েছিলেন একটা দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি। ৮০ ফুট উঁচু। তামা দিয়ে তৈরি। হিউয়েন সাঙ যখন নালন্দায় তখন সম্রাট হর্ষবর্ধন একটা বিহার বানিয়ে দিয়েছিলেন, আগাগোড়া পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে।

হিউয়েন সাঙ আসছেন, এই খবরটা নালন্দায় পৌঁছানো মাত্রই চারজন বিশিষ্ট ভিক্ষু সাত যোজন দূরে এগিয়ে গিয়ে প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। পথের মাঝখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আর জলযোগ করলেন সেই বাড়িতে, মৌদ্‌গল্যায়নের জন্মস্থান বলে যার দশদিকে খ্যাতি। তারপর বেরোল তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা। দুশো জন ভিক্ষু আর কয়েক হাজার গৃহস্থ মানুষ, ধূপ জ্বালিয়ে, পতাকা উড়িয়ে, ফুল ছড়িয়ে, জয়ধ্বনি দিয়ে, তাঁর গুণগান গেয়ে নালন্দায় পৌঁছে দিলেন তাঁকে। তাঁকে যখন শীলভদ্রের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি পা চুম্বন করে মাটিতে লুটিয়ে দিলেন মাথা। তারপর কুশল জিজ্ঞাসা। এই সময় শীলভদ্রের অনুরোধে তাঁর ভাইপো বুদ্ধভদ্রের মুখ থেকে

হিউয়েন সাঙ শুনলেন এক আশ্চর্য কাহিনী।

গত কুড়ি বছর ধরে শূল বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন শীলভদ্র। তিন বছর আগে সেটা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি মৃত্যু চাইছিলেন নিজের। সেই সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন একদিন। তিনজন দেবতা, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়, তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন যে, মৃত্যু নয়, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে সূত্র আর শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্যে। আর তোমার কাছে আসছে চীন দেশের একজন ভিক্ষু। ভার নিতে হবে তাঁর শিক্ষার। ব্যস! সেই স্বপ্নের পর থেকে শূলবেদনা শরীর থেকে উবে গেল চিরদিনের জন্যে।

এই স্বপ্ন কাহিনী শুনে হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রকেই মেনে নিলেন তাঁর গুরু হিসাবে। হিউয়েন সাঙ প্রথম সাতদিন অতিথি হয়ে রইলেন বুদ্ধভদ্রের। যে আশ্রমে থাকতেন, সেটা বালাদিত্য রাজার সঙ্ঘারাম। তার পর তাঁর জন্যে বাড়ি ঠিক করা হল বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের বাড়ির উত্তরে। প্রত্যেকদিন তাঁকে উপহার পাঠানো হত ১২০টা জাম, ২০টা সুপুরি, ২০টা জায়ফল, আধছটাক কর্পূর, আর সের দশেক মহাশালি চাল। সে চাল দেখতে ছিল সিমের বিচির মতন বড়ো। আর তেমনি তার সুগন্ধ। প্রত্যেক মাসে তাঁকে তিনরকম তেল, প্রয়োজন মতন ঘি আর অন্যান্য খাবার বা রাঁধার জিনিস পাঠানো হত। একটা হাতি দেওয়া হয়েছিল, ঘোরা-ফেরার জন্যে। আর দুজন ব্রাহ্মণ, তাঁকে পরিচর্যা করার জন্যে।

নালন্দার সাত মাইল দক্ষিণে রাজগৃহ বা রাজগীর। পড়াশুনা করতে করতেই হিউয়েন সাঙ একবার বেরিয়ে পড়লেন রাজগৃহ দেখতে। একদিন ছিল রাজা বিম্বিসারের রাজধানী। তখন রাজগৃহ নাম ছিল না। ছিল কুশাগারপুর। কুশাগারপুরে প্রায়ই আগুন লাগতো ঘরে ঘরে। তখন বিম্বিসার আইন জারি করে দিলেন, যার বাড়িতে আগুন লাগবে, তাকে পালাতে হবে রাজধানী ছেড়ে। তারপর একদিন আগুন লাগল খোদ রাজবাড়িতেই। বিম্বিসার তাঁর রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন এক মাইল উত্তরে। হিউয়েন সাঙ

দেখেছেন সেই নতুন রাজধানীর ভাঙা প্রাচীর।

বুদ্ধ অনেকবার থেকেছেন এই রাজগৃহে। গৃধ্রকূট নামের পর্বত ছিল তাঁর তপস্যার জায়গা। অনেকবার শিষ্যদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন এখান থেকেই। আর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাঁর শিষ্যদের প্রথম সভা ডাকা হয়েছিল এইখানেই।

রাজগৃহের পর আবার নালন্দা। কিছুদিন পরে বেরিয়ে পড়লেন বাংলাদেশের দিকে। প্রথমে পৌঁছলেন মুঙ্গেরে। তখন মুঙ্গেরের নাম ছিল ইরিন বা অনুর্বর পর্বত। দশটা সঙ্ঘারাম ছিল সেখানে। থাকত দশ হাজার হীনযান সাধু। মুঙ্গের থেকে জলপথে পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলার দিকে।

তিনি যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছলেন তখন রাজা হর্ষবর্ধনের পয়লা নম্বরের শত্রু রাজা শশাঙ্ক মারা গেছেন। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে তখন। বগুড়ায় অর্থাৎ এখনকার বাঁকুড়া জেলার সাতমাইল উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন। সমৃদ্ধ জনপদ। দেখে খুশি হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভাল লেগেছিল নদীর তীরে বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের সরকারি আপিসগুলো। ফুলের বাগান দিয়ে মোড়া। তিনি লিখেছেন, এখানকার মাটি সমতল। খুব উর্বর। কাঁঠাল ফলে প্রচুর। মানুষেরা লেখাপড়ায় অনুরাগী। দেখেছেন বারোটা সঙ্ঘারামে তিনহাজার ভিক্ষু।

পুণ্ড্রবর্ধনের পর ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ। এখন যার নাম রাঙামাটি। তাঁর ভাষায়—

এই রাজ্যের পরিধি হল প্রায় দুশো মাইল। চার মাইল লম্বা। অনেক লোকজনের বাস। বেশির ভাগ মানুষ ধনী। নিচু জমি খুব উর্বর। আবহাওয়া সুন্দর। শস্য হয় প্রচুর। ফুল ফোটে অজস্র। মানুষেরা যত্ন নিয়ে লেখাপড়া শেখে। ব্যবহারে ভদ্র। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস দুটোই সমান সমান। এখানে সঙ্ঘারাম আছে দশটা। ভিক্ষু দু হাজার। দেবতার মন্দির পঞ্চাশটা।

একটা সঙ্ঘারাম আছে, অনেক তলা। নাম, রক্তমৃত্তিকা। তার কাছেই রয়েছে সম্রাট অশোকের তৈরি একটা স্তূপ।

সমতট বা দক্ষিণ বাংলা দেখে তিনি লিখেছেন—

জমি খুব উর্বরা। রাজধানী, সম্ভবত যশোহর, পরিধিতে চার মাইল। এখানেও শস্য আর ফুলের ফসল প্রচুর। আবহাওয়া যেমন, মানুষজনও তেমনি সুন্দর। অধিকাংশ মানুষ লেখাপড়ায় অনুরাগী। মিলে-মিশে থাকে সবরকম সম্প্রদায়ের লোক। সঙ্ঘারাম দেখেছেন প্রায় তিরিশটা। বৌদ্ধ ভিক্ষু দু হাজার। একটা সঙ্ঘারামে বুদ্ধের একটা মূর্তি ছিল আট ফুট উঁচু। নীল রঙের স্ফটিক দিয়ে তৈরি।

এরপর তাম্রলিপ্ত। লিখেছেন—

সমুদ্রের একটা বড় অংশ ঢুকে পড়েছে এই শহরে। এখানে জমা হয় পৃথিবীর মূল্যবান সব জিনিসপত্র। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ধনী।

তাম্রলিপ্ত থেকে তাঁর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল সিংহলে। কিন্তু কয়েকজন ভিক্ষু তাঁকে বোঝালেন যে, সমুদ্রপথে সিংহল যেতে অনেক বিপদ। তার চেয়ে ডাঙাপথে ঘুরে আসুন দাক্ষিণাত্য। হিউয়েন সাঙের মনে পড়ল নাগার্জুনের নাম। ভারতবর্ষে, আর চীনে, দুদেশেই তাঁর সমান সমাদর। বিখ্যাত মহাযানী পণ্ডিত। কনিষ্কের সভায় আর নালন্দাতেও থেকেছেন তিনি অনেকবার। তাঁর লেখা প্রায় আঠারো-উনিশ খানা ধর্মগ্রন্থ আর কবিতার বই অনুবাদ হয়েছে চীনে ভাষায়। এছাড়াও তিনি বই লিখেছেন জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসার উপর। চীনদেশে সবচেয়ে বেশি চল ছিল তাঁর লেখা চোখের অসুখের চিকিৎসা বিষয়ের বইটা।

হিউয়েন সাঙ পা বাড়ালেন বিদর্ভ নগরীর দক্ষিণে কোশলের দিকে। এখন নাম হয়েছে, ছত্তিশগড়। উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি।

কোশল দেখা শেষ করে পা বাড়ালেন অন্ধ্রের দিকে। অন্ধ্র থেকে দ্রাবিড় দেশে, অর্থাৎ মাদ্রাজে। তখন সেখানে পল্লভবংশীয়দের রাজত্ব। রাজধানী কাঞ্চীপুর। এখন যার নাম হয়েছে কাঞ্চীভরম। প্রধান

বন্দর, মহাবলীপুরম। মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য নিয়ে হিউয়েন সাঙ কিছুই লেখেন নি। কেউ কেউ অনুমান করেন, গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন বলেই হিন্দুদের দেবদেবীর দিকে চোখ পাতেন নি।

কাঞ্চীপুরে অনেকদিন রয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন তাঁর গুরুর গুরু অর্থাৎ শীলভদ্রের গুরু ধর্মপালের স্মৃতিচিহ্ন। কাঞ্চীপুরের রাজা তাঁর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন নিজের রুপসী কন্যাটিকে ' কিন্তু ধর্মপালের কাছে রাজা বা রাজকন্যার চেয়ে ধর্ম ছিল অনেক বড়।

এই কাঞ্চীপুরে থাকতে থাকতেই খবর পেলেন, সিংহলে লেগেছে গৃহযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ। এমন কি সিংহল থেকে পালিয়ে আসা অনেক ভিক্ষুর সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল তাঁর। মন থেকে মুছে ফেললেন সিংহল যাত্রার স্বপ্ন।

এরপর মহারাষ্ট্র। মারাঠাদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

এরা দীর্ঘকায়। প্রকৃতি সরল হলেও ভিতরে ভিতরে খুব গর্বিত স্বভাব। ক্রোধী। যশের জন্যে উৎসুক। কর্তব্যে দৃঢ়। মৃত্যুভয় কাকে বলে জানে না। কেউ উপকার করলে আজীবন কেনা গোলাম। অপকার করলে প্রতিহিংসার ছোবল সব সময়েই উঁচু। লড়াইয়ে নামার আগে শত্রুকে সতর্ক করে দেয়। যুদ্ধের শেষে পলাতককে তাড়া করে ঠিকই। কিন্তু শরণার্থীকে আক্রমণ করে না। নিজেদের দলপতি বা সেনাপতি হেরে গেলে, তাকে এরা প্রাণে মারে না। কেবল পরিয়ে দেয় মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ। লজ্জায় অপমানে সে দলপতির তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

হিউয়েন সাঙ যখন মহারাষ্ট্রে, তখন সেখানে পুলকেশিদের রাজত্ব। সুখ-সমৃদ্ধির শেষ নেই তখন রাজত্বে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। ঘোড়া ছুটিয়ে যেদিকে ছোটেন, সেদিকটাই জয় হয়ে যায় তাঁর। বাধা দেবে, সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, এমন ক্ষমতা নেই কারো। ছিল কেবল এই পুলকেশিদের।

হর্ষবর্ধনের প্রবল অনুরাগী হয়েও হিউয়েন সাঙ পুলকেশিদের প্রশংসা করতে দ্বিধা করেন নি এতটুকু! তাঁর মতে—

পুলকেশিদের ধর্ম বিষয়ে মতামত উদার। তাঁদের রাজ্য দূর-দূরান্তে ছড়ানো। প্রজারা রাজার প্রতি অনুগত। রাজারা যুদ্ধ ভালবাসেন। যুদ্ধজয়ের গৌরবই তাঁদের জীবনে সবচেয়ে বড় গৌরব। তাই পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈন্যদের যুদ্ধের সাজসজ্জার দিকে সবসময়েই কড়া নজর। যুদ্ধের নিয়ম-কানুন কঠোর। রাজ্য জুড়ে রয়েছে কয়েক শ' অসীম সাহসী যোদ্ধা। প্রত্যেকবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা পান করে উত্তেজক পানীয়। তখন তারা একটা বর্শা হাতে নিয়ে শত্রুর দশহাজার সৈন্যকেও তোয়াক্কা করে না। পিছনে বাজে যুদ্ধের দামামা। তারা এগিয়ে যায়। এই সময় কেউ পথরোধ করে দাঁড়ালে, তাকে হত্যা করতে হাত কাঁপে না তাদের। আর এর জন্যে তাদের আইনত শাস্তি হয় না। যুদ্ধের সময় উত্তেজক পানীয় খাওয়ানো হত হাতিশালায় হাতিদেরও। যাতে তারা প্রবল ঝড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শত্রুর সৈন্যদলের উপর।

অনুমান করা হয়, বর্ষাকালটা তিনি ছিলেন পুলকেশিদের রাজধানী নাসিকে।

মহারাষ্ট্রের অনেকগুলো চৈত্য ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তিনি। অজন্তা সম্বন্ধে লিখেছেন—

মহারাষ্ট্রের পূব দিকে একটা অন্ধকার উপত্যকায় পাহাড়ের গায়ে একটা সঙ্ঘারাম। ভিতরে অনেকগুলো বড় বড় গুহা। এগুলো তৈরী করেছে পশ্চিম ভারতের অর্হৎ 'আচারা'। বিহারের ভিতরে চারদিকের দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা আঁকা। ছবিগুলো যেমন নির্ভুল, তেমনি চমৎকার।

এরপর মালব। এই মালবে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি লিখেছেন—

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দুটো প্রদেশের মানুষ তাদের বিদ্যানুরাগের জন্যে বিখ্যাত। তার একটা হল উত্তর-পুর্বের মগধ। আরেকটা হল দক্ষিণ-পশ্চিমের মালব। এদের আচার-আচরণে শিষ্টাচার। এরা শিল্পের গুণগ্রাহী। সংস্কৃতিবান।

এরপর সৌরাষ্ট্র, বল্লভী ঘুরে আর বর্ষাকালের দুটো মাস পর্বত

দেশে অর্থাৎ জম্মুতে কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন নালন্দায়, গুরুর পায়ের কাছে। ভারত-তীর্থ ঘুরে ঘুরে দেখা শেষ। এবার আবার অধ্যয়ন।

কিছুদিন পরে বজ্র নামে একজন নগ্ন সন্ন্যাসী ঢুকে পড়লেন হিউয়েন সাঙের ঘরে। তিনি নাকি ভবিষ্যৎ বক্তা। হিউয়েন সাঙ বললেন,

—আমি এক বছর কয়েক মাস ধরে শাস্ত্র আলোচনা আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাটালাম। এখন ফিরতে চাই নিজের দেশে। আপনি আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলুন, আমি দেশে ফিরতে পারবো কিনা, ফেরা উচিত হবে কিনা, আর কতদিন আমার পরমায়ু।

বজ্র কোষ্ঠী বিচার করে জানালেন,

—আপনার পক্ষে এখানে থাকাই ভালো। ভারতবর্ষের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে। ফিরে যেতে পারেন। তবে খুব কিছু ভালো ঘটবে না তাতে। আপনি বাঁচবেন আরও দশ বছর।

হিউয়েন সাঙ জানালেন, ফিরে যাওয়াটাই আমার ইচ্ছে। কিন্তু যে-সব দেবমূর্তি আর ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেছি, সেগুলো কি করে নিয়ে যাব?

—তার জন্যে চিন্তা নেই। রাজা শিলাদিত্য আর কুমার রাজা আপনার নির্বিঘ্নে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—সে কি? আমি তো এখনও ঐ দুই রাজাকে চোখেই দেখি নি। ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হবে কি আমার?

—কুমার রাজা আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে আগেই দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু-তিনদিন পরে তারা এখানে এসে পৌঁছবে। কুমার রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আপনি হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

সন্ন্যাসী বজ্র চলে গেলেন। হিউয়েন সাঙ তখন সত্যিই দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল। তিনি গোছাতে বসলেন নিজের জিনিসপত্র। তাঁর এই চলে যাওয়ার খবরটা কানে পৌঁছুল গুরু শীলভদ্রের। ডেকে পাঠালেন শিষ্যকে।

—আপনি দেশে ফিরতে চাইছেন কেন ?

যিষ্য সবিনয়ে জানালেন,

—এখানে, বুদ্ধের এই পুণ্য জন্মভূমিতে, এসেছিলাম মানুষের উপকারের জন্যে তাঁর মহাধর্ম শিখতে। অশেষ অনুগ্রহ নিয়ে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই দেশের নানা তীর্থস্থান আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছি। এখন আনন্দে ভরে উঠেছে আমার হৃদয়। আমি স্বদেশে ফিরে এই শিক্ষা ও আনন্দের ভাগ দিতে চাই আমার দেশবাসীকে। এতে আপনাদেরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে আমাদের দেশ।

উত্তর শুনে শীলভদ্র খুশি। বললেন,

—আপনি ঠিকই ভেবেছেন। আপনার ইচ্ছার প্রতি আমারও সমর্থন রইল। বন্ধুরা! কেউ আর একে বাধা দিও না।

বাধা এল অন্য দিক থেকে। বজ্র নামের সেই সন্ন্যাসী ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, তেমনটিই ঘটল এর দুদিন পরে। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মণ বা কুমার রাজার কাছ থেকে সত্যি সত্যিই দূত এসে হাজির হল শীলভদ্রের কাছে। তিনি শীলভদ্রকে লিখেছেন,

—আপনার শিষ্য চীন দেশের মহাভিক্ষুর সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। অনুগ্রহ করে তাঁকে পাঠাবেন।

শীলভদ্র উত্তরে জানালেন, তিনি এখন স্বদেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত। তাঁর পক্ষে কামরূপে যাওয়া সম্ভব নয়।

আবার দূত পাঠালেন কুমার রাজা। আবার সবিনয় অনুরোধ। এবারেও শীলভদ্রের পক্ষ থেকে উত্তর গেল, অসম্ভব।

আবার দূত এল কুমার রাজার কাছ থেকে। হাতে চিঠি। চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

আপনার এই শিষ্য এতকাল মগ্ন ছিল সাংসারিক আনন্দে। বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ফিরে তাকায় নি। এবার ভেবেছিলাম, একজন বিদেশী ভিক্ষুর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনে অন্তরে ধর্মের বীজ বুনব। আপনি আমাকে বারবার নিরাশ করছেন। আপনি কি চান পৃথিবীর লোক

অন্ধকারে থাকুক ? আমি আবাব দূত পাঠালুম। এবারেও যদি না পাঠান, তাহলে জয় হবে আমার দুর্বুদ্ধিরই। প্রয়োজন হলে সৈন্যরা হাতির ঝাঁক নিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে আসবে আপনাদের নালন্দাকে। এ সিদ্ধান্তের কোনরকম নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবার আপনি কী করবেন, ভেবে দেখুন।

শীলভদ্র হিউয়েন সাঙকে বললেন, এই রাজাটা দেখছি নির্বোধ। ওর দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় নি। তবু রাজা আপনার একজন ভক্ত। সুতরাং যেতে পারেন। এর ফলে রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটতে পারে।

হিউয়েন সাঙ চলে এলেন কুমার রাজার রাজধানীতে। রাজকীয় আতিথ্যে দিন কাটতে লাগল। ওদিকে তখন হর্ষবর্ধন গঞ্জাম জয় করে ফিরে এসে শুনলেন, হিউয়েন সাঙ কামরূপে। তখুনি সংবাদ পাঠালেন কুমার রাজার কাছে। চীনা ভিক্ষুকে যেন এখুনি আমার কাছে পাঠানো হয়। কুমার রাজা উত্তরে বললেন, আমার মাথা দেব, তবু তাঁকে দেব না। হর্ষবর্ধন সে উত্তর পেয়ে তখুনি পাঠালেন তাঁর দূতকে। দূতের হাতে চিঠি। চিঠিতে লেখা, দূতের হাতে মাথাটা পাঠিয়ে দেবে।

এবার টনক নড়ল কুমাররাজার। বুঝলেন, বোকামি করেছেন হর্ষবধর্নকে চটিয়ে। সাজানো হল কুড়ি হাজার হাতি। আর ত্রিশ হাজার নৌকা। সঙ্গে সৈন্যবাহিনী। হিউয়েন সাঙকে নিয়ে কুমার রাজা চললেন হর্ষবর্ধনের কাছে। হর্ষবর্ধন তখন রাজমহলে। গঙ্গার উত্তর তীরে। কুমার রাজা নিজেই ছুটলেন সম্রাটের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে।

রাত তখন প্রহর। নদীর তীরে হঠাৎ দেখা গেল হাজার হাজার মশালের আলোয় আকাশ যেন সূর্যোদয়ের মতন রাঙা। বাজছে বাজনা। শত শত সোনার ঢাক। হর্ষবর্ধন এক পা হাঁটেন। আর একবার করে বেজে ওঠে সেই ঢাক। তখন অন্য কোনো রাজার এই ভাবে ঢাক বাজিয়ে হাঁটার ক্ষমতা ছিল না।

হিউয়েন সাঙয়ের সামনে এসে হর্ষবর্ধন হাতের ফুল আর সারা

শরীরের আনত প্রাণাম লুটিয়ে দিলেন তাঁর পায়ে। কবিতা পাঠ করে স্তুতি করলেন ধর্মগুরু। তারপর বললেন,

—আজ আপনি বিশ্রাম করুন। আগামী কাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাবে প্রাসাদে।

পরের দিন সকালে আবার সেই সোভাযাত্রা। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চললেন হিউয়েন সাঙ এবং কুমার রাজা। প্রাসাদে দিন কাটতে লাগল ধর্মের আলোচনায়। দেখতে দেখতে এসে গেল শীতকাল। শীতের শুরুতেই হর্ষবর্ধন পা বাড়ালেন কান্যকুজের দিকে। সেখানে মহাসভা। হর্ষবর্ধনের নির্দেশ সেখানে তৈরী হয়েছে ছুটো প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ। আগে থেকে সেখানে সববেত হয়েছেন নালন্দা থেকে প্রায় একহাজার ভিক্ষু। এসে পৌঁছলেন আঠারো-উনিশটা দেশের রাজা। হীনযান মহাযান মিলিয়ে তিন হাজার ভিক্ষু, তিন হাজার ব্রাহ্মণ। সঙ্গে তাঁদের অনুচর আর ভক্তরা। গুণী মানুষেরা কেউ এসেছেন পালকিতে, কেউ হাতির পিঠে, কেউ রথে। এছাড়া সমবেত হয়েছেন দেশের গণ্যমান্য-মানুষ, রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনীর লোকেরা।

এসে গেল সভা আরম্ভের প্রথম দিন। সভাস্থল থেকে মাইল-খানেক পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ। সেখান থেকে শুরু হল শোভাযাত্রা। সাজানো হাতির পিঠে কারুকার্য খচিত হাওদা। তার উপরে রাখা হল বুদ্ধের সোনার মুর্তি। ছুদিকে আরো ছুটো হাতি। ডান দিকের হাতিতে হর্যবর্ধন। হাতে চামর। বাঁদিকের হাতিতে কুমার রাজা। হাতে ছত্র। ছুজনেরই মাথায় দেবতাদের মত সোনার মুকুট গলায় ফুলের মালা। আর রত্ন দিয়ে গড়া হার। বুদ্ধমূর্তির সামনে আরো একশো হাতিতে আছে বাজনদারের দল। পিছনে পাঁচশো যুদ্ধের হাতিতে রাজার অনু-চরেরা। হিউয়েন সাঙও হাতির পিঠে। সভামণ্ডপের সামনে তৈরি হয়েছে একটা একশো ফুট উঁচু মন্দির আর বেদী। সেইখানে এসে থামল শোভাযাত্রা। হর্যবর্ধন নিজে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললেন বুদ্ধপ্রতিমা। রাখলেন মন্দিরে। তারপর আরম্ভ হল পুজো, নানা বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে। প্রথম দিনের ধর্মসভা আরম্ভের আগে শুরু হল

ভোজ। বাছাই করে একহাজার বিদ্বান ভিক্ষু, পাঁচশো ব্রাহ্মণ, অন্যান্য পণ্ডিত, দুশোজন রাজমন্ত্রী আর রাজাদের আমন্ত্রণ জানানো হল সেই ভোজ-সভায়, মণ্ডপের ভিতরে। ভোজের পর আবার মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তির সামনে পুজো। তারপর শুরু হল সভার কাজ। সভাপতির আসনে হিউয়েন সাঙ।

হিউয়েন সাঙ প্রশংসা করলেন মহাযান ধর্মের। তাঁর সেই রচনা একজন শ্রমণ ঘুরে ঘুরে দেখালেন সমস্ত পণ্ডিতদের। তারপর টাঙিয়ে দেওয়া হল সেটা সভার তোরণ দ্বারে। ঘোষণা করা হল যদি কেউ এই মতামত ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তবে হিউয়েন সাঙ নিজের মাথা দেবেন।

সকাল পেরিয়ে রাত হল। রাতের পর আবার দিন। দিন যেতে যেতে পাঁচদিন হয়ে গেল। কোনোখান থেকেই উঠল না প্রতিবাদের সামান্য একটু শব্দ। কিন্তু হর্ষবর্ধনের কানে এল, ষড়যন্ত্র হচ্ছে হিউয়েন সাঙকে হত্যার। তিনি আদেশ জারি করে দিলেন, হিউয়েন সাঙকে যদি কেউ আঘাত করে তাহলে তার প্রাণদণ্ড। যদি কেউ তার বিরুদ্ধাচারণ করে, তাহলে কেটে দেওয়া হবে জিভ। দেখতে দেখতে আঠারো দিন হয়ে গেল যখন আর তর্ক করতে সাহস দেখালেন না কেউ, তখন উপস্থিত রাজারা হিউয়েন সাঙকে সম্বর্ধনা জানালেন প্রচুর ধন-রত্ন দিয়ে। তিনি সেগুলো ছুঁলেন না। তারপরই হর্ষবর্ধনের নির্দেশে তাঁকে হাতির পিঠে বসিয়ে ঘোরানো হল চারপাশে। ঘোষণা করা হল, তাঁর সর্ববাদীসম্মত পাণ্ডিত্য। হিউয়েন সাঙ প্রথমে রাজি হন নি এই সম্মান নিতে। হর্ষবর্ধন জানালেন, এটাই হল দেশের প্রথা। এরপর মহাযানীরা তাঁকে উপাধি দিলেন, মহাযানদেব। হীনযানীরা দিলেন মোক্ষদেব। পরের দিনই শেষ হবে সভা। সেইদিন ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মন্দির। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সভামণ্ডপের সামনের তোরণের উপরকার সানাই ঘর। আগুন নিভে যাওয়ার পর হর্ষবর্ধন মন্দিরে উঠলেন, কী ঘটেছে দেখতে। দেখে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। সেই সময় একজন আততায়ী ছুরি

নিয়ে আক্রমণ করতে ছুটে এল তাঁকে। হর্ষবর্ধন তাঁকে ধরে ফেললেন। চতুর্দিক থেকে ছুটে এল সবাই। সকলের চোখে শান-দেওয়া ছুরির মতন রাগ। রাজারা বললেন, আততায়ীকে হত্যা করা হোক এখুনি। হর্ষবর্ধন বারণ করলেন। আততায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি,

—আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি যে, তুমি এ কাজ করলে ?

আততায়ীর উত্তর,

—মহারাজ ! আপনি পুণ্যবান। আপনার জ্যোতি সকলের উপর। আমি হীন বিধর্মী। বিধর্মী হিন্দুদের কথায় এগিয়ে এসেছিলাম এই হত্যায়।

—বিধর্মীরাই বা কেন এমন অসৎ কাজ করতে চাইল ?

—মহারাজ আপনি সকলকে সব দিয়েছেন। কিন্তু বিধর্মীদের সঙ্গে প্রায় কথাই বলেন নি।

ডাকা হল উপস্থিত পাঁচশো ব্রাহ্মণকে। প্রশ্ন করা হল, কী তাঁদের মতলব। জানা গেল জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে তাঁরা আগুন ধরিয়েছিলেন মন্দিরে। এই সময় যে বিশৃঙ্খলা ঘটবে, সেই সুযোগে সম্রাটকে হত্যা করা হবে। সেটা হয় নি বলেই, ঐ আততায়ীকে পাঠানো হয়েছিল অস্ত্রসহ।

বিচারে শাস্তি হল অপরাধের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির। বাকিদের তিনি নির্বাসনে পাঠালেন ভারতবর্ষের বাইরে।

সভা শেষ। হিউয়েন সাঙ তাঁর নালন্দার সহপাঠী বা সহধর্মী ভিক্ষুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এলেন হর্ষবর্ধনের কাছে।

—এবার বিদায় দিন। দেশে ফিরে যাই।

হর্ষবর্ধন বললেন,

—আমি সম্রাট হয়েছি তিরিশ বছর। প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগের সঙ্গমে ভারতবর্ষের শ্রমণদের, ব্রাহ্মণদের, দরিদ্রদের পঁচাত্তর দিন ধরে ধনরত্ন দান করে থাকি। এ রকম পাঁচটা 'মোক্ষসভা' আগে হয়ে গেছে। ছ'বারেরটা সামনেই। দেশে ফিরবার আগে এটা দেখে যান।

হিউয়েন সাঙ রাজি হয়ে গেলেন।

তিন মাইল জুড়ে সভাস্থল। প্রকাণ্ড জমি আয়নার মতন সমতল। মান, দানের মাঠ। একটা চারকোনা জমি। তার চারটে দিকই দেড় হাজার ফুট লম্বা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার ভিতরে শত শত খড়ের চালাঘর। চালাঘরের ভিতরে থাকে-থাকে সারে-সারে দানের জিনিস। সোনা, রুপো, মুক্তো, লাল কাঁচ, ইন্দ্রনীল, আরো কত কি। লম্বা লম্বা গুদাম ঘরে রেশম আর সুতোর পোশাক। আর সোনা-রুপোর টাকা। এছাড়া আছে আরও শ-খানেক লম্বা ঘর, যেখানে বিশ্রাম করে মানুষেরা।

প্রথমদিন ময়দানের একটা ঘরে স্থাপন করা হল বুদ্ধের মূর্তি। দ্বিতীয় দিন আদিত্যদের মূর্তি। তৃতীয় দিন মহেশ্বরের। চতুর্থ দিন দশ হাজার ভিক্ষুকে উপহার দেওয়া হল একশো করে সোনার টাকা, একটা সুতোর কাপড়, ফলমূল, পানীয় আর গন্ধদ্রব্য। এরপর কুড়িদিন চলল ব্রহ্মণদের উপহার দেওয়া। তারপর দশ দিন ধরে বিধর্মীদের উপহার দেওয়া। তারপর দশ দিন ধরে দুই দেশ থেকে আসা ভিক্ষুদের। তারপর এক মাস ধরে দরিদ্র মানুষের। দান করতে করতে সব যখন শেষ, হর্ষবর্ধন একজন দরিদ্রকে দান করে বসলেন নিজের পরনের পোশাকটাও। নিজে তার বদলে পরলেন, বোন রাজশ্রীর কাজ থেকে চেয়ে নেওয়া একটা পুরনো কাপড়।

সভা শেষ। হিউয়েন সাঙ বললেন,

—এবার অনুমতি দিন। আমি ফিরে যাই নিজের দেশে।

কেউই তাঁকে ছাড়তে রাজি নয়। তিনি বললেন,

—আমি যা শিখেছি তা জানাবার জন্য আমার দেশের মানুষেরা উদগ্রীব। আমাকে বাধা দেবেন না। সূত্রে লেখা আছে, ধর্মের জ্ঞান প্রচারের কাজে বাধা দিলে অন্ধ হতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে।

হর্ষবর্ধন বললেন,

—আপনার কী চাই বলুন, পাথেয় হিসেবে।

হিউয়েন সাঙের গলায় সহজ উত্তর,

—কিছুই নয়।

রাজারা সকলেই এগিয়ে এল ধনরত্ন নিয়ে। তিনি কিছুই নিলেন না। নিলেন কেবল একটা লোমশুদ্ধ চামড়ার জামা, কুমার রাজার কাজ থেকে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে।

যেন কত কালের নিকট আত্মীয় চলে যাচ্ছে বিদেশে, এমনি ব্যথায় সকলের মুখ মলিন চোখে জল। বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলেন রাজারা। হিউয়েন সাঙ এবার সত্যিই পা বাড়ালেন স্বদেশের দিকে।

হিউয়েন সাঙ যখন দেশে ফিরছেন, সঙ্গে অনেক জিনিস। তার মধ্যে অনেকগুলো বুদ্ধের মূর্তি। কোনটা সোনার, কোনটা চন্দন-কাঠের, কোনটা রুপোর। আর ছিল পুঁথি। অসংখ্য, তার মধ্যে বেশ কিছু হারিয়ে গিয়েছিল সিন্ধুনদী পার হওয়ার সময়। তিনি নদী পার হয়েছিলেন হাতির পিঠে চেপে। পিছনে নৌকায় ছিল জিনিসপত্র। সেই সময় নদীতে উঠলো ঝড়। তাঁর পুঁথিপত্র ছিল যে সঙ্গীটির কাছে, ভয়ে তিনি ঝাঁপ দিয়ে বসলেন নদীতে। তাঁকে অন্যেরা ধরে তুলল বটে, কিন্তু হারাতে হল পঞ্চাশটা পুঁথি, আর নানান রকম ফুলের বীজ।

স্বদেশের বাইরে ছিলেন মোট ষোলো বছর। তারমধ্যে তেরো বছর ভারতবর্ষে। চীন সম্রাট থাই-চুঙ তাঁর ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে সাদর আহ্বান জানালেন তাঁকে। ক্ষমা করলেন তাঁর বিনা অনুমতিতে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার অপরাধ। সম্রাট আগ্রহী হয়ে উঠলেন তাঁর মুখ থেকে দেশবিদেশের কথা শুনতে। হিউয়েন সাঙ রাজপ্রাসাদে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে সম্রাটকে শোনাতে লাগলেন নিজের অভিজ্ঞতা। সম্রাট চেয়েছিলেন, ধর্ম ছেড়ে হিউয়েন সাঙ যোগ দিক রাজকাজে। তিনি রাজী হন নি। তখন সম্রাট অনুরোধ করলেন, তাঁর এই ভ্রমণকাহিনীর বিবরণটা লিখে ফেলতে। সেই সঙ্গে লোক দিলেন, সংস্কৃত পুঁথিগুলোকে চীনে ভাষায় অনুবাদ

করার কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। তাঁর জন্যে খুলে দিলেন সি-এন মন্দিরের দরজা। হিউয়েন সাঙ এইখানেই রয়ে গিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছেন, তবু যোগাযোগ বন্ধ নেই। চিঠিপত্র, রাজদূত বা ভ্রমণকারীদের মধ্যে দিয়ে চলেছে চিন্তার আদান-প্রদান। ৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পৌঁছল তাঁর হাতে। লিখেছেন বৌদ্ধ পণ্ডিত স্থবির প্রজ্ঞাদেব।

—"আপনাকে একখণ্ড শাদা বস্ত্র পাঠাচ্ছি। আমরা যে এখনো আপনাকে ভুলি নি, তারই নিদর্শন হিসেবে। সামান্য হলেও এটি গ্রহণ করবেন। আপনার কী কী ধর্মগ্রন্থ প্রয়োজন, তালিকা পাঠালে তার প্রতিরূপ আপনাকে পাঠাব।"

হিউয়েন সাঙ তার উত্তরে লিখলেন—"ভারতবর্ষ থেকে সদ্য প্রত্যাগত জনৈক রাজদূতের মুখে সংবাদ পেলাম যে মহামহিম শীলভদ্র আর জীবিত নেই। এই সংবাদে আমার হৃদয় ভরে গেছে বিপুল শোকে। সামান্য উপহার পাঠালুম গ্রহণ করবেন।"

৬৬৪তে মৃত্যু ঘটল এই পুণ্যবানের।

তাঁর লেখা থেকে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি আমরা। প্রথমেই ধরা যাক শিক্ষার কথা। বালকদের প্রথমে পড়ানো হত 'সিদ্ধিরস্তু'। তার আবার তিনটে ভাগ আসলে 'সিদ্ধিরস্তু' হল, বর্ণপরিচয়। তারপর শব্দবিদ্যা, মানে ব্যাকরণ। তারপর চিকিৎসা বিদ্যা, হেতু বিদ্যা, অধ্যাত্ম-বিদ্যা। ব্রাহ্মণেরা পড়তেন চতুর্বেদ। যিনি শিক্ষক হবেন তাঁকে সব কিছুই জানতে হবে গভীর ভাবে। বেশি উৎসাহ দেওয়া হতো বুদ্ধিমান ছাত্রদের। ভীরু কিংবা বোকা ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হতো আরো ভালো হওয়ার জন্যে। শিক্ষা শেষ করা হতো তিরিশ বৎসর বয়সে।

প্রত্যেক প্রদেশে রাজার একজন কর্মচারী থাকতো, যার কাজ দেশের ঘটনাবলী লিখে রাখা। এই বিবরণকে বলা হতো, নীলপিট।

এরপর তাকানো যাক শহরের চেহারার দিকে।

শহর বা গ্রাম ঘেরা উঁচু আর চওড়া দেয়াল দিয়ে। রাস্তার দুধারে দোকানপাট। বাড়িগুলো কাঠের। তার উপরে চুন বালি লেপা। টালির ছাদ। আকারে চীন দেশের মতনই। বাড়ির দোতলায় বারান্দা। সঙ্ঘারামগুলোও কাঠের তৈরী। কিন্তু তার ভিতরে ও বাইরে নানান রকম কারুকাজ।

কসাই, জেলে, নাচিয়ে, জল্লাদ আর মেথরেরা থাকে শহরের বাইরে। তারা হাঁটে রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে।

ঘরের ভিতরে বিশ্রামের জন্য মাদুর। সম্ভ্রান্ত লোকেদের মাদুরগুলোয় নানার রকম নক্‌শা। কিন্তু মাপে সব এক। রাজার সিংহাসন খুব উঁচু। অনেক মণিমুক্তো দিয়ে সাজানো। সূক্ষ্ম আর দামি কাপড়ে মোড়া। রত্নে সাজানো পাদানিটাও। শাদা কাপড়ই পরে সবাই। পুরুষরা কাপড়টা পরে কোমর থেকে বগল পর্যন্ত, ছড়িয়ে, ডান দিকের কাঁধ খোলা। মেয়েদের শাড়ি পা পর্যন্ত, সারা গায় ঢাকা মাথার উপরে যদিও খোঁপা, তবু পিটের চুল আলগা করে ছড়ানো। পুরুষরা কেউ গোঁফ রাখে, কেউ কামায়। গলায় থাকে ফুলের মালা, কারো রত্নহার। হিন্দু, জৈন, সন্নাসীরা কেউ পরে ময়ুরের পালক, কেউ পরে মড়ার খুলি দিয়ে গাঁথা মালা, কেউ পরে গাছের পাতা বা ছাল, কারো মাথা কামানো, কারো মাথায় জটা। যারা সোনার ব্যবসায়ী তারা চলাফেরা করে খালি পায়ে। এদের দাঁত পান খেয়ে কালো অথবা লাল। এরা চুল বাঁধে, কান বেঁধায়, নাকে গয়না পরে। এদের চোখ টানা টানা, বড়। খাবার আগে স্নান করে সকলে। মাটি বা কাঠের বাসনে খেলে সেগুলো ভেঙে ফেলা হয় খাওয়ার পর। এঁটো হাতে কেউ কাউকে ছোঁয় না। হলুদ অবথা চন্দনের গন্ধ মাখে সারা গায়ে। রাজা যখন স্নান করেন, বাজনা বাজে, স্তোত্র পড়া হয়।

প্রণাম বা সম্মান জানানোর প্রথাও অনেক রকম। তার মধ্যে আছে, মিষ্টি কথা, মাথা নুইয়ে সম্মান দেখানো, দুটো হাত উঁচু করে মাথা নোয়ানো, দুটো হাত একজোড় করে মাথা নোয়ানো, একটু

হাঁটু বেঁকানো, দুটো হাঁটুকেই মুড়ে বসা, হাত আর হাঁটু মাটিতে রাখা, এছাড়া আছে পঞ্চচক্র। অর্থাৎ দুটো হাঁটু, দুটো হাত আর কপাল মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম করা। তারপর হল সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

অসুখবিসুখ হলে প্রথমেই সাতদিন উপোস। তাতে যদি রোগ না সারে তখন ওষুধ।

হিউয়েন সাঙ ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, তাঁর মন-প্রাণ সব ধর্মের দিকে। ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার দিকে মন ছিল না তাঁর। তবু চলতে-ফিরতে যা চোখে পড়েছে সবই লিখেছেন। আর তাঁর সেই লেখা, তাঁর সময়কার ভারতবর্ষকে জানতে আমাদের পক্ষে একটা মূল্যবান উপকরণ। এত মমতা আর শ্রদ্ধা নিয়ে কোনো বিদেশী বুঝি ভারতবর্ষকে ভালবাসেনি। জীবনে মোট ৭৬খানা বই লিখেছিলেন তিনি। তার মধ্যে একটা হল, সি-য়ু্য-কি। এর মানে হল ভারতভূমির বিবরণ।

মার্কো পোলো

ইতালির ভেনিস শহরের নাম কে না জানে। ব্যবসায়ী আর বাণিজ্যের দেশ। পৃথিবী জুড়ে তার নাম ডাক। পৃথিবীর সেরা জিনিসপত্র এসে পৌঁছায় এখানে জাহাজে চেপে। আবার এখান থেকেই জাহাজে চেপে চালান যায় পৃথিবীর নানা দিকের, নানা দেশের হাটে-বাজারে-বন্দরে। এশিয়ার জিনিস, বিশেষ করে মশলাপাতি, ইউরোপে বেচে ভেনিসের ঐশ্বর্য ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল এক সময়। এই সব ব্যবসায়ীদের সাধারণভাবে বলা হতো 'লম্বাদ'। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নামে মহাকবি শেক্সপীয়রের লেখা একটা নাটক আছে। পড়লেই বোঝা যায়, এক সময় কী প্রভাব-প্রতাপ ছিল এদেশের ব্যবসায়ীদের। সেই ভেনিসে আন্দ্রিয়া পোলো নামে এক ব্যবসায়ীর তিন ছেলে। মার্কো, নিকোলো আর ম্যাফিও। মণি-মুক্তোর ব্যবসা ছিল এদের। কনস্ট্যানটিনোপলে ছিল বড় ভাই মার্কোর নিজস্ব কারবার। পরের দুভাই নিকোলো আর ম্যাফিয়া ঘুরে বেড়াতেন দেশে দেশে।

অনেকদিন ধরে নদীতে-সমুদ্রে, দেশে-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একবার এসে পড়লেন কিপচাক নামের একটা রাজ্যে। ভল্‌গা নদীর কিনারে যে-সব তাতার বংশ, তাদের রাজা তিনি। নাম বর্কা। রাজা থাকেন রাজধানী সারাই-য়ে। সব রাজার কাছেই বিদেশী বণিকদের কদর ছিল তখন। বর্কাও ভেনিসের দুই ব্যবসায়ীকে খাতির করে ডেকে পাঠালেন রাজসভায়। দুই ভায়ের কাছে যত ভালো ভালো হীরে-জহরত ছিল, রাজাকে দেখালেন তাঁরা। তার থেকে বাছাই করে কয়েকটা উপহারও দিলেন রাজাকে। রাজা নিজেও খুব উঁচু মনের মানুষ। তিনি রত্ন চেনেন। মূল্যবান জিনিস উপহার পেয়ে তার বদলে বণিক ভাইদুটিকে উপহার দিলেন তাঁদের দেওয়া মণি-মাণিকের চেয়ে দামি দামি রত্ন। এক বছর তাঁরা রয়ে গেলেন ঐ রাজার কাছে।

এবারে দেশে ফিরতে হবে। ভেনিসের জন্য, জন্মভূমির জন্য দুই ভায়েরই মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি। ফেরার জন্যে জিনিস-পত্র, বাক্‌সো-প্যাঁটরা গোছাতে শুরু করেছেন, এমন সময় ঘটে গেল এক কাণ্ড। তাঁদের আর ভেনিসে ফেরা হল না। ইলাকু আর বর্কার মধ্যে লেগে গেল গৃহ যুদ্ধ। নিকোলো আর ম্যাফিও পালিয়ে গেলেন বোখারায়।

ইলাকু কে সে কথাটা বলা হয় নি। চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন এক বিরাট যোদ্ধা। যেমন নৃশংস, দুর্ধর্ষও তেমনি। সারা জীবন যুদ্ধ করে, রাজ্যের পর রাজ্য রক্তে ভাসিয়ে, রক্তে নদীর জল, পথের ধুলো লাল করে দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন একটা বিশাল সাম্রাজ্য। চীন থেকে ভল্‌গা নদীর পাড় পর্যন্ত। চেঙ্গিস খাঁ মারা যাওয়ার পর শুরু হয়ে গেল সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি। চীন অঞ্চলের সর্বেসর্বা হলেন চেঙ্গিসের নাতি কুবলাই খাঁ। তাঁরই আরেক ভাই ইলাকু হলেন পারস্য, আর্মেনিয়া, মেসোপটেমিয়া—এই সব রাজ্যের শাসনকর্তা। দুই ভাই দুদিকের সম্রাট। কিন্তু মনে মনে তা নিয়ে কোন হিংসা-দ্বেষ নেই। প্রত্যেকেই স্বাধীন। তবুও তাতার জাতির মাথা

হিসেবে কুবলাই খাঁ সকলের কাজ থেকেই পান আলাদা সম্মান, সমাদর। বর্কার সঙ্গে ইলাকুর যখন যুদ্ধ বেধেছে, সেই সময় ইলাকু তাঁর একজন দূতকে পাঠাচ্ছিলেন কুবলাই-এর কাছে। দূত যখন বোখারায়, তখনই তাঁর চোখে পড়ল দুজন বিদেশী বণিক। বিদেশী অথচ তাতার ভাষায় কথা বলতে পারে অনর্গল। বণিক দুজনের সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি। আলাপ করে মুগ্ধ। ভাবলেন, কুবলাই খাঁ-এর মত গুণগ্রাহী সম্রাটের কাছে যদি এঁদের নিয়ে যাই, খুবই খুশি হবেন তিনি। দূত প্রস্তাব পেশ করলেন বণিকদের কাছে। বণিকরা ভেবে দেখলেন, মন্দ কি প্রস্তাবটা। দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কখন কোথায় কী বিপদ ঘটে তার ঠিক নেই। তার উপর নতুন রাজ্যে গিয়ে হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বরাত খুলে যেতে পারে আরো ভালোর দিকে। রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা। এইভাবে নিকোলো আর ম্যাফিও এসে পৌঁছলেন একদিন কুবলাই খাঁ-এর রাজদরবারে।

কুবলাই খাঁ-ও দুজন বিদেশী অতিথিকে কাছে পেয়ে খুব খুশি। তাঁদের আদর-আপ্যায়ণে ত্রুটি রাখলেন না এতটুকু। নিজে যেমন রাজসুখে থাকেন, রাজভোগ খান, রাজপুরীতে ঘুমোন, অতিথি দুজনের জন্যেও, তেমনি রাজকীয় আরামের ব্যবস্থা। দুবেলা অতিথিদের সঙ্গে গল্প করেন তিনি, একটা নতুন দেশকে জানবার ইচ্ছায়। প্রশ্ন করেন, ভেনিস দেশটা কেমন, কেমন তার মানুষ-জন, বিচার-আচার, রাজা-রাজড়াদের জীবন, কেমন ভাষা, কেমন সংস্কৃতি সব কিছু নিয়েই। আর মুগ্ধ হন উত্তর শুনে। কথায় কথায় একদিন উঠল পোপের নাম। পোপ সম্বন্ধে সব কিছু শুনে কুবলাই খাঁ একদিন বলে বসলেন, আমি দূত পাঠাতে চাই পোপের কাছে। আর চাই আপনারা দুজনেই হবেন সেই দূত। আমার বিশ্বস্ত সেনাপতি থাকবে সঙ্গে। আমি একটা চিঠিও দিয়ে দেবো আপনাদের হাতে, পোপের নামে। আরও একটা অনুরোধ ছিল তাঁর। জেরুজালেমে যিশুখ্রীস্টের সমাধি। সেই সমাধির সামনে জ্বলে যে প্রদীপ, সেই প্রদীপ থেকে তাঁর জন্যে আনতে হবে একটুখানি তেল। প্রস্তাব শুনে দুই ভাই-ই

রাজি। কুবলাই খাঁ পোপকে লিখলেন, অনুগ্রহ করে আমার রাজ্যে এমন একশো জন বিদ্বান বুদ্ধিমান ধার্মিককে পাঠান, যাঁদের কাছ থেকে আপনাদের খ্রীস্ট ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশ অনেক কিছু জানতে পারবে।

একটা শুভ দিন দেখে শুরু হল যাত্রা। যাবার আগে পোপকে লেখা চিঠির সঙ্গে দুই ভায়ের হাতে কুবলাই খাঁ তুলে দিলেন একটা সোনার ফলক। তাতে খোদাই করে লেখা রয়েছে, এই দূতেরা যেন রাজ্যের সব জায়গাতেই পায় থাকা-খাওয়া এবং বিশ্রামের সুযোগ-সুবিধে। অশ্ব চাইলে যেন অশ্ব পায়। অস্ত্র চাইলে অস্ত্র। অর্থ চাইলে অর্থ। সাহায্য চাইলে সাহায্য।

ঘোড়ার পিঠে তিন জোয়ান। দুই পোলো আর তাতার সম্রাটের সেনাপতি। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই পথের মাঝখানে অসুস্থ হয়ে পরলেন সেই সেনাপতি। অগত্যা তাঁকে ফেলে রেখেই পোলোরা পাড়ি দিলেন দূর পথে।

১২৬৯। তখন এপ্রিল মাস। দূত দুজন এসে পৌঁছলেন একর-এ। আর পৌঁছতে না পৌঁছতেই খবর পেলেন, মারা গেছেন পোপ। নতুন পোপের নির্বাচন হতে এখনও অনেক দেরি। দুই ভাই ভাবতে বসলেন, কী করা যায় এখন ? কতদিন হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকবো বিদেশে ? তার চেয়ে একটা কাজ করলেই হয়! এই ফাঁকে একবার নিজেদের দেশটা ঘুরে আসা যাক। ন বছর হল আমরা দেশ-ছাড়া, সংসার ছাড়া। কতদিন মুখ দেখি নি ঘরের মানুষদের। চলো ঘুরে আসি ভেনিস।

ভেনিসে পৌঁছে, নিজের সংসারে পা দিয়ে নিকোলোর বুকটা ফেটে গেল দুঃখে। হায়! হায়! করে জ্বলে উঠল শোকের আগুন, হাড়ে পাঁজরে। চিরকালের জন্যে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন তিনি। ভিজে কাপড় নিংড়োলে যেমন করে জল পড়ে, নিকোলোর মনের মধ্যে, চোখের মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে সেই রকম ভাবে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জল।

শেষ পর্যন্ত একদিন জল শুকোল চোখের। স্ত্রী নেই। কিন্তু ছেলে তো আছে। একমাত্র ছেলে। কতটুকু ছিল, যখন দেশ ছেড়ে চলে যান। এখন সেই ছেলের বয়স পনের। কী সুন্দর স্বাস্থ্য! কী ঝলমলে চোখ! মাথায় সমুদ্রের ঢেল-এর মত চুল! সেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে, স্ত্রীর শোকটা সামলে নিলেন নিকোলো। সেই ছেলের নামই, মার্কো পোলো। নিকোলোর বড় ভাই মার্কোর নামে নাম।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলো ছু-ছুটো বছর। আর বসে থাকা ঠিক নয়! পোপ নির্বাচিত হোক বা না হোক, খবরটা নিয়ে এখুনি যাত্রা করা যাক কুবলাই খাঁ-এর কাছে। ভেনিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। সঙ্গে সতেরো বছরের ছেলে মার্কো।

ফেরার পথে আবার এসে পৌঁছলেন সেই একর-এ। দেখা করলেন রোমান পোপের প্রতিনিধির সঙ্গে। নাম, পিয়াসেনজা। নিকোলোর অনুরোধে তিনি চিঠি লিখে দিলেন একটা কুবলাই খাঁ-এর নামে।

আপনার দূতেরা ঠিক সময়েই এখানে পৌঁছেছিল। কিন্তু পোপ বেঁচে না থাকায় আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা গেল না।

পিয়াসেনজার অনুমতি নিয়েই তাঁরা জেরুজালেম থেকে সংগ্রহ করলেন প্রদীপের তেল। ঐ তেল আর চিঠি নিয়ে তিনজনে পাড়ি দিলেন কুবলাই খাঁ-এর রাজত্বের দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে-না-যেতেই কানে এল, নির্বাচিত হয়ে গেছেন নতুন পোপ। আর তিনি হলেন সেই পিয়াসেনজা-ই। আবার ছুটে এলেন তাঁরা একর-এ। দেখা করলেন পোপের সঙ্গে। কুবলাই চেয়েছেন একশ জন বিদ্বান পাদরি। অত লোক পাওয়া সম্ভব নয়। নতুন পোপ নিকালোদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ঠিক করে দিলেন ছুজন প্রতিনিধিকে। সেই সঙ্গে প্রচুর উপহারও দিলেন কুবলাই খাঁ-কে।

পাদরি ছুজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি কুবলাই খাঁ-এর কাছে। যে-পথ দিয়ে তাঁরা আসছিলেন, সেই পথে তখন চলেছে

বিবার্স নামের একজন সুলতানের অত্যাচার, লুঠ-পাট, আক্রমণ। প্রাণের ভয়েই খানিকটা এসে তাঁরা আর যেতে রাজি হলেন না কিছুতেই। যাই হোক, অনেক বাধা-বিপদ, কাটিয়ে, বরফের দেশে ঠাণ্ডায় কুঁকড়িয়ে, গ্রীষ্মের দেশে রোদে পুড়ে, কখনো ডাঙ্গা পথে ঘোড়ায় চেপে, কখনো জলপথে জাহাজে চেপে, বৃষ্টিতে ভিজে, বন্যার নদীতে কূল হারিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে তাঁরা ফিরে এলেন কুবলাই-এর রাজত্বে। কুবলাই তখন ছিলেন অন্য শহরে। কেমেন-ফু-তে। বিদেশী অতিথিদের আবার কাছে ফিরে পেয়ে মহা খুশি তিনি। বসবার আসন পেতে দিলেন নিজের সিংহাসনের পাশে। আর সেই সময়েই তাঁর চোখ পড়ল তরুণ মার্কোর দিকে।

—ছেলেটি কে?

নিকোলো বিনীত ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন,

—আমার ছেলে আর আপনার দাস।

উত্তর শুনে মুগ্ধ হলেন কুবলাই। প্রসন্ন হাসি দিয়ে অভিবাদন জানালেন তরুণ মার্কোকে। আর সেই মুহূর্ত থেকেই মার্কো হয়ে গেলেন কুবলাই-এর প্রিয়পাত্র। প্রিয় পুত্রের মতোও। মার্কো ছেলেবেলা থেকেই বুদ্ধিমান। অল্প দিনের মধ্যেই শিখে নিলেন তাতার, মাঙ্গোল, পারসী আর চীন—এই চারটে ভাষা। যেমন লিখতে, তেমনি বলতে।

কুবলাই-এর চোখ জহুরির মত। মার্কো যে সাধারণ জাতের ছেলে নয়, তার দেখার চোখ, বোঝার মন যে আর দশজনের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর, এটা বুঝতে একদিনও দেরি হয় নি তাঁর। হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠালেন মার্কোকে, দরবারে।

—আমি তোমাকে বিদেশে পাঠাতে চাই আমার দূত হিসেবে।

মার্কো তো প্রস্তাব শুনেই আহ্লাদে আটখানা। আমি তো এইই চাই। ঘুরে-ঘুরে, তন্ন-তন্ন করে দেখবো পৃথিবীকে। জানব দেশ-দেশান্তরের মানুষকে, প্রকৃতিকে। এইই তো আমার দিনরাতের স্বপ্ন।

কুবলাই খাঁ বললেন,

—প্রথমেই তোমাকে পাঠাতে চাই কারা-জঙ্গ নামের একটা রাজ্যে। এখান থেকে ছ'মাসের পথ। পারবে?

—পারব।

এর আগে অনেককেই দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন দূর দেশে। যে-কাজের জন্যে তাঁদের পাঠিয়েছেন, সে-কাজ তাঁরা ভালভাবেই সেরে এসেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেন নি কেউ। যে-দেশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানকার মানুষ-জন, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মকর্ম, এর কোনো কিছুর দিকেই এক পলকের জন্যে ভুরু তুলে তাকাবার ইচ্ছে জাগে নি তাঁদের মনে।

মার্কো তাঁর কাজ শেষ করে ফিরে এলেন। কুবলাই খাঁ আর তাঁর পাত্রমিত্রেরা অভিভূত হয়ে শুনতে লাগলেন মার্কোর ভ্রমণ কাহিনী। চোখে যেন ফটোগ্রাফের মত তুলে এসেছেন সব দৃশ্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। সব কিছু। মার্কো বলে চলেছেন। কুবলাই খাঁও যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন একটা জলজ্যান্ত নতুন দেশকে।

মার্কো-র ভিতর এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখতে পেয়ে একদল লোক বলে উঠল,

—এই যুবক যেদিন বড় হবে, মানুষের মত মানুষ হবে একজন।

সেই থেকে একটানা সতেরো বছর মার্কোকে থেকে যেতে হলো কুবলাই-এর কাছে! কুবলাই অবশ্য তাঁকে পোষা পাখির মত আটকে রাখেন নি খাঁচায়। থেকে থেকেই উড়িয়ে দিতেন নতুন নতুন দেশ-দেশান্তরের আকাশে। ওড়া শেষ করে সেই পাখি যখন ফিরে আসত নিজের দাঁড়ে, কুবলাই কান ভরে শুনতেন তাঁর ওড়ার অভিজ্ঞতা।

রাজ-দরবারে ক্রমশ বাড়তে লাগল মার্কো-র সম্মান-সমাদর। আর তাতে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল অনেকের বুক। মার্কো তা জানেন। জেনেও ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি তো রাজকীয় সম্মানের

ভিখারী নই। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই পৃথিবী, জানতে চাই অজানা দেশকে। সেটাই আমার সুখ, আমার গর্ব, আমার আনন্দ। আমি হতে চাই বিশ্ব-পর্যটক।

ইতিহাসও তাই বলে। তাঁর আগে পৃথিবীতে এমন কেউ জন্মান নি, যিনি পৃথিবীর এত বিশাল পরিধি জুড়ে ঘুরেছেন, দেখছেন, জেনেছেন। পৃথিবীর পূর্ব দেশ বা প্রাচ্য দেশ বা এসিয়া সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকেই নতুন সব তথ্য প্রথম জানতে পারল পৃথিবীর মানুষ। তিনি পৃথিবীতে সম্মানিত হলেন এক অসাধারণ প্রতিভা হিসেবে। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া গেল নাবিক, আবিষ্কারক, ব্যবসায়ী আর দক্ষ শাসককে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী একদিন মাতিয়ে তুলেছিল সারা য়ুরোপকে, পৃথিবী আবিষ্কারের আগ্রহে। এই মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী পড়েই ক্রীস্টোফার কলম্বাস-এর চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল অজানা পৃথিবীকে আবিষ্কার করার স্বপ্নে।

অথচ শুনলে তোমাদের অবাক লাগবে এই মার্কো পোলোই, যতদিন বেঁচেছিলেন, নিজের দেশে সম্মান পান নি এতটুকুও। দেশের মানুষ তাঁর নাম দিয়েছিল, মিথ্যুক। তাঁর প্রত্যেকটি কথাকে তাঁরা ধরে নিয়েছিল বানানো রূপকথা। তিনি রাস্তায় বেরোলে ছোট ছেলেরা তাঁকে চেপে ধরতো, আজ আর একটা দেশের রূপকথা শোনাও। আর দেশের বড় বড় মানুষগুলো তো নিত্যই বিদ্রূপ আর অপমান করে যেতো তাঁকে, মিথ্যের বিশারদ বলে। মার্কো-র সব কথা বানানো। যে-সব অজানা দেশের গল্প বলে বেড়ান, সবই তাঁর মনগড়া। এমন কি যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখনো এই অপমানের হাত থেকে রেহাই নেই। সমাজের শিরোমণিরা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ডাক্তার, কেউ রাজকর্মচারী, কেউ চার্চের যাজক আর সেই সঙ্গে তাঁর শত্রুরা, সবাই মিলে তাঁর শিয়রে বসে বারংবার বলেছে,

—এখনো সময় আছে। স্বীকার করে যাও যে, যা বলেছি এতদিন সব মিথ্যের স্তূপ।

মার্কো এর উত্তরে বলেছিলেন,

—আমি নিজের চোখে যা দেখেছি, তার মাত্র অর্ধেকটা বলছি আপনাদের কাছে।

অবশ্য একটা মুদ্রাদোষ ছিল মার্কোর। কথায় কথায় লক্ষ বা লাখো বিশেষণটা ব্যবহার করতেন তিনি। অমুক দেশে গেলাম, সেখানে লক্ষ লক্ষ জাহাজ। লক্ষ লক্ষ মানুষ। কুবলাই খাঁ-এর রাজসভার লাখো লাখো বাকসো বোঝাই ধনরত্ন। এক একটা রত্নের দাম লাখো টাকা। তাই লোকের মুখে মুখে তাঁর একটা চলতি নাম রটে গিয়েছিল, লাখো মার্কো। ইতালীয় ভাষায়, মার্কো মিলিয়নি।

বহু বছর বিদেশে কাটিয়ে তিন পোলো যখন দেশে ফিরেছিলেন, তখন ইতালিতে গৃহযুদ্ধ চলেছে। ভেনিস আর জেনোয়া, পাশাপাশি দুটো রাজ্য। এদের সম্পর্ক যেন সাপ আর নেইলের। একবার জেনোয়া আক্রমণ করে ভেনিসকে। একবার ভেনিস আক্রমণ করে জেনোয়াকে। একবার এ হারে। একবার ও জেতে। দেশ জুড়ে যখন এইরকম একটা বিশ্রী ঝোড়ো হাওয়া, তিন পোলো পা ফেললেন দেশের মাটিতে।

দেশে ফিরেও বিপদ। তাঁদের মুখে তাতার ভাষা শুনে, তাতারদের মত পোশাক-আশাক দেখে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না যে, এরাই সেই ব্যবসায়ী পোলো। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক, দেখলেই চিনতে পারতেন, তাঁরা সব মারা গেছেন একে একে। পোলোরা পড়লেন মহা ঝামেলায়। কী করে এই সব মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় যে, আমরাই সেই পোলো, ভেনিসের ছেলে, তাতার দেশের কেউ নই। ভাবতে ভাবতে বেরোলো একটা উপায়। পোলোরা একদিন নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের। তিন পোলোর পরণে সাটিনের পোশাক। নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন করলেন সেই পোশাকে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে সবাই যখন খেতে বসেছে, তিন পোলা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু পোশাক গেছে বদলে। সাটিনের বদলে এখন লাল

রেশম। আর আগের পরা পোশাকগুলো তাঁরা বিলিয়ে দিলেন চাকরদের। খাওয়া শেষ হল। খাওয়ার পরই আবার পোশাক পালটালেন তাঁরা। এবারের পোশাক ভেলভেটের। এবারে আবার আগের পরা পোশাকগুলো, যা ছিল লাল রেশমের, সেগুলোও বিলি করে দিলেন চাকরদের। এই সব হয়ে যাওয়ার পর নিজেরা পরে এলেন সাধারণ দেশী পোশাক। অতিথিদের শুনিয়ে বসলেন, মঙ্গোল-দের ভোজনসভায় এই ভাবে পোশাক উপহার দেওয়াটা একটা রীতি।

ইতিমধ্যে, উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ যেন চিনতে পারছিলেন পোলোদের। আরে, ওকে তো মনে হচ্ছে নিকোলোর মতই। আরে, এইতো আমাদের সেই ম্যাফিয়া। কেউ বললেন হায় ভগবান, আমাদের সেই মার্কো এমন জোয়ান-মদ্দ হয়ে উঠল কবে? পুরোপুরি চিনে উঠতে যেটুকু বাকি ছিল, সেটা ঘটল তার পরেই। সাধারণ পোশাকটা পালটে তিন পোলো খানিক পরেই পরে এলেন তাতার দেশের পোশাক, যা পরে পৌঁচে-ছিলেন ভেনিসে। তারপর পোশাকের ভিতরকার সেলাইগুলো কাঁচি দিয়ে কাটতে লাগলেন কুট কুট করে। আর সঙ্গে ঝনাৎ ঝনাৎ করে সোনা রুপোর টাকা, খুটুর খুট্ করে দামি দামি মণিমুক্তো ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে। সেই দৃশ্য দেখে আত্মীয়-স্বজনের চোখ উঠল কপালে। আরে বাবা! এতো রাজ-রাজড়ার মত ঐশ্বর্য। যাদের মনে সন্দেহ ছিল, সব উড়ে গেল নিমেষে। ঐশ্বর্যের গন্ধ পেয়ে সবাই স্বীকার করে নিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ এরা পোলোই বটে। শুরু হয়ে গেল গলাগলি, কোলাকুলি, ভাব-ভালোবাসা। শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল পোলাদের-খ্যাতি প্রতিপত্তির খবর।

পোলোরা যখন পা দিল ভেনিসের মাটিতে, তার আগে থেকেই দেশ জুড়ে চলেছে যুদ্ধ। তারই মধ্যে বছর দুয়েক ভেনিসের বাতাসটা ছিল খানিকটা ঠাণ্ডা। বাতাসে নেই বারুদের গন্ধ। শহরের চোখে মুখে নেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। রাজপথে নেই মৃত্যু আর রক্তের দাগ। কিন্তু তিন বছরের মাথায় আবার যুদ্ধের শুরু। সেটা ১২৯৮ সাল।

এবারে ভেনিসই প্রস্তুত, জেনোয়াকে সমুদ্রপথে ঘায়েল করার জন্য। যুদ্ধে যোগ দিলেন মার্কো-ও। তিনি হলেন একটা জাহাজের 'জেন্টলম্যান কমাণ্ডার'। মার্কোর বরাত মন্দ। সেবারের যুদ্ধে জয় হল জেনোয়ার। ভেনিস হেরে ভূত। বন্দী হল ভেনিসের সাত হাজার নাগরিক। তাদের মধ্যে মার্কোও একজন। জেনোয়ার জেলখানায় বন্দী হলেন তিনি। তবে খুব বেশি কঠোর আচরণ করা হয় নি তাঁর উপর। অ্যাডভেঞ্চারার হিসেবে তাঁর জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল খানিকটা সুখ-সুবিধের।

জেল থেকে মার্কোকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা করে-ছিলেন তাঁর বাবা, কাকা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একমাত্র ছেলের এই দুর্দশায় নিকোলো ভেঙ্গে পড়লেন মনের দুঃখে। কবে যে ছেলে মুক্তি পাবে কে জানে! হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না। এই সব ভাবতে ভাবতে মনের দুঃখে নিকোলো বিয়েই করে ফেললেন একটা।

মার্কো জেলখানার যে কামরায় থাকতেন, সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল আরও একজন। নাম রাস্তিসিয়ানো। পিসা শহরের মানুষ। লেখক। রোমাঞ্চকাহিনীকার হিসেবে মোটামুটি নামডাক দেশে। মার্কো সম্ভবত গোড়ায়-গোড়ায় মুখেই তাঁর সঙ্গীটিকে শুনিয়ে যেতেন নিজের দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণকাহিনী। আর হয়তো শুনতে শুনতেই রাস্তিসিয়ানো একদিন বলে উঠেছিল,

—দাঁড়াও। আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি। তুমি বলো। আমি লিখি।

মার্কো রাজি। এশিয়ার চার চারটে প্রধান ভাষা জানতেন বটে মার্কো, কিন্তু মাতৃভাষাটা ভালো জানতেন না। তাই নিজে কিছু লিখবেন, এমন ইচ্ছে মনে জাগে নি কোনোদিন। সঙ্গীর কথায় উৎসাহ পেয়ে শুরু করলেন গল্প বলা। লিখে চললেন সঙ্গীটি। একজনের মহামূল্য অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপ দিতে বসে গেলেন এক অভিজ্ঞ লেখক। লেখা শেষ হল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেল থেকে

মুক্তি পেলেন মার্কো। জেলে ছিলেন মাত্র একবছর। ১২৯৯-এর গ্রীষ্মে ফিরে এলেন ভেনিসে। এসেই বিয়ে করলেন। স্ত্রী ডোনাটা। বিয়ের পর এক এক করে তিন কন্যে। ফন্টিনা, বেলেলা, মরেটা। বিয়ের পর আরও পঁচিশটা বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। খুবই শান্ত জীবন। গৃহস্থ মানুষ। আর সমুদ্রে পাড়ি দেন নি কোনোদিন। সংসারের সমুদ্রেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন শেষ জীবন।

১৩২৭। জানুয়ারী। তাঁর মৃত্যুদিন। আশ্চর্য, মৃত্যুর মুহূর্তেও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর। মৃত্যুর সকালেই উইল পড়ছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময়ে কোথাও কোনও শোক নেই। ভেনিস কিংবা ইতালি তখনও জানে না, তারা হারাল তাদের মাটির একজন শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে। কোথাও কোনো শোকযাত্রা নেই। নেই সমাধিভূমিকে ঘিরে অশ্রুপাত। মার্কো আসলে তাঁর বেঁচে থাকা অবস্থায় বিখ্যাত হন নি। হয়েছিলেন অনেক পরে। মার্কোর পাণ্ডুলিপি থেকে যেদিন আবিষ্কৃত হলো এশিয়া মহাদেশের, বিশেষ করে চীনের সত্য ইতিহাস, পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন এই পাণ্ডুলিপির এক বর্ণও মিথ্যা নয়, এশিয়ার সম্বন্ধে জানবার পক্ষে এই পাণ্ডুলিপি জ্ঞানের খনি, সেই দিন থেকেই একটু একটু করে বাড়তে লাগল শ্রদ্ধা এবং সম্মান।

অজস্র কপি হয়েছিল সে পাণ্ডুলিপির। নাম 'দি বুক অব মার্কো পোলো'। ৮৫টা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা আছে ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়ামে আর লাইব্রেরিতে। পাণ্ডুলিপি প্রথম বই হিসেবে ছাপা হয় ১৫৫৯-এ, সেটা ছিল ইতালীয়ন ভাষায় লেখা। ১৮২৪-এ ছাপা হয় ফরাসি ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি। তাঁর যে পাণ্ডুলিপিটা জোগাড় করে পড়েছিলেন কলম্বাস, আর পড়েই মেতে উঠেছিলেন এশিয়া মহাদেশের সন্ধানে, সেটা ছিল ল্যাটিন ভাষায় লেখা।

এবার চোখ ফেরানো যাক ভ্রমণকাহিনীর দিকে। অবশ্যই গোটা ভ্রমণকাহিনী নয়। আমরা শুধু ভারতবর্ষটুকুকেই দেখব তাঁর চোখ দিয়ে। মার্কো ভারতবর্ষের ভিতরে ঢোকেন নি। সমুদ্রতীরের বন্দরে নেমে, কাজ করে চলে গেছেন। বাংলা দেশেও আসেন নি কোনোদিন।

অথচ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বাংলাদেশের কথা আছে। সামান্যই যদিও। ঐতিহাসিকরা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বলে দিয়েছেন, মার্কো বাংলায় আসেন নি কোনোদিন। অথচ বইয়ে লিখেছেন, 'বেঙ্গল'-এর কথা। ঐতিহাসিকদের মতে পেগুকেই তিনি ভুল করে বেঙ্গল বলেছেন।

তবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ঠিকই। ভারতবর্ষের ভিতরে নয়। সমুদ্রতীরের দেশে। নাম মাবার। এখন যার নাম করোমণ্ডল। উপকূল। মার্কোর মতে, সেটা ছিল বৃহত্তর ভারতের একটা অংশ। আর ভারতবর্ষের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশ। পাঁচজন রাজা শাসন করেন সেই রাজ্য। তাঁরা পাঁচ ভাই। এই রাজ্যের গায়ে রয়েছে উপসাগর। সেখানে পাওরা যায় অফুরন্ত মণিমুক্তো। ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে যে-যার নিজের জাহাজে বা নৌকোয় চেপে মণিমুক্তোর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। বছরের ছুটো মাস, এপ্রিল আর মে হল 'পাল' পাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সময়। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর হিসেবে প্রচুর মণিমুক্তো পেতেন দেশের রাজা। ব্রাহ্মণরাও ভাগ পেতেন মুক্তোর। শিকারে বেরোবার আগে ডুবুরিদের মঙ্গলের জন্যে মন্ত্র পড়ে দিতেন বলে। সারা মাবার চষে বেড়ালেও দর্জি দেখা যাবে না একজনও। কারণ, সেখানকার মানুষদের সব সময়েই খালি গা। রাজার পোশাকটাও সাধারণ প্রজার মত। পার্থক্য কেবল গয়নায়, রাজার পরনে সামান্য যেটুকু পোশাক, তা থেকে ঝোলে মণিমুক্তো আর প্রবাল দিয়ে গাঁথা ঝালর। গলায় রত্নহার। হাতে রত্নবলয়। এমন কি পা ছুটোও অলঙ্কার দিয়ে মোড়া। রাজা যে এত বেশি মণিমুক্তো পরেন, তার কারণ নিজের রাজত্বেই এটা প্রচুর পাওয়া যায়। একজন রাজার গায়ে সব মিলিয়ে যত সোনা আর রত্ন থাকে, তা দিয়ে যে-কোনো একটা শহর কেনা যায়। রাজ্য জুড়ে কড়া হুকুম ছিল রাজার দামি দামি মণিমুক্তো রাজ্যের বাইরে যাবে না। রাজাই সেগুলো কিনবেন দ্বিগুণ দাম দিয়ে। রাজা মারা গেলে, রাজকোষে বোঝাই হয়ে থাকা ধনরত্নের একটা ছিটে ফোঁটাও কিন্তু ছোঁবে না তাঁর ছেলে। নিজের

রাজকোষ তিনি নিজে গড়ে নেন আলাদা। এইভাবে বংশানুক্রমে রাজ্যে জমা হয়ে চলেছে অতুল সম্পদ।

রাজার আয় থেকে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় ঘোড়ার জন্যে। বছরে প্রায় দু হাজারের মত ঘোড়া কেনেন রাজা, মধ্য এশিয়ার রাজার থেকে। বছরের শেষে তার থেকে বাঁচে মাত্র একশ টার মত। কারণ, এই সব ঘোড়াকে কিভাবে পালন করতে হয় এরা জানে না। ব্যবসায়ীরাও শিখিয়ে দেয় না। না শেখালেই তাদের লাভ। প্রজারা মূর্তি পুজো করে। সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে ষাঁড়কে। এ রাজ্যে কেউ গরু বা ষাঁড় কাটে না। তাদের মাংসও খায় না দেশের নারী ও পুরুষ স্নান করে দুবেলা, সকালে আর সন্ধ্যেয়। খায় ডান হাত দিয়ে। কখনো খাবারে বাঁ হাত ছোঁয়ায় না। তারা যখন জল বা জলীয় কিছু পান করে, পাত্রে ঠোঁট ছোঁয়ায় না পাত্রটিকে শূন্য রেখে মুখের মধ্যে পানীয় ঢালে। মার্কো দেখেছেন, এক মজার ব্যাপার। মহাজনের কাছে কর্জ করেছে কেউ। তার পর আর টাকাটা শোধ করছে না বারবার তাগাদা পেয়েও। এই সময় মহাজন যদি কোনও ভাবে তার দেনদারের চারপাশে একটা বৃত্ত এঁকে দিতে পারেন মাটিতে, তাহলে টাকা না মিটিয়ে বা মেটাবার ঠিকমত প্রতিশ্রুতি না দিলে তিনি সেই বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারবেন না। জোর করে বেরিয়ে এলে রাজার আইনে শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড। রাজা নিজেও এই নিয়ম মেনে চলেন মাথা নুইয়ে। একবার হয়েছিল কি, রাজা ধার করেছিলেন কিছু টাকা এক বিদেশী বণিকের কাছে। তারপর দিন যায়। বণিক তাগাদা দেয়। রাজা আর টাকা শোধ করেন না। একদিন রাজা ঘুরে বেড়াচ্ছেন শহরের রাজপথে, ঘোড়ায় চেপে। বিদেশী বণিক কৌশলে একটা বৃত্ত এঁকে দিলেন রাজার চারপাশে। রাজা নিজের গড়া নিয়ম ভাঙলেন না। প্রতিশ্রুতি দিলেন তখুনি দেনা শোধের। এই দেশের আবহাওয়া গরম। গরম বলেই সাধারণ মানুষ এমন নগ্ন। বৃষ্টি না হলে সব বুঝি পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। জুন থেকে আগস্ট এই তিনমাস প্রচুর বৃষ্টি পড়ে বলেই রক্ষে।

এখানকার মানুষের একটা মস্ত গুণ, এরা শারীর বিদ্যা জানে মুখ বা শরীরের হাত পায়ের গড়ন-গাঠন দেখে নারী বা পুরুষের চরিত্র বলে দিতে পারে। কারোর ছেলে হলেই তারা তার জন্ম মূহূর্তের সব কিছু তথ্য কাগজে লিখে রাখে। ছেলের বয়স তেরোয় পৌঁছলেই তারা তাকে বার করে দেয় ঘরের বাইরে, সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে। এখন থেকেই তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে, নিজের রোজগারে জীবন কাটাতে হবে, শিখে নিতে হবে ব্যবসা-বাণিজ্য।

শুধু এই রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে এমন সব পশুপাখি আছে যা আমাদের দেশের মতো নয়। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে একমাত্র তিতির পাখিটাই। এখানকার বাদুড়গুলোকে দেখতে বাজপাখির মতো। আর এখানকার বাজপাখিগুলো কাকের মতো কুচকুচে কালো।

কি রাজা, কি প্রজা সবাই বসেন মাটিতে। যেহেতু মাটি থেকে তাঁরা জন্মেছেন এবং জীবনের শেষে মিশে যাবেন মাটিতেই, তাই মাটির প্রতি তাঁদের এই ভালবাসা। রাজ্যে এমন শৃঙ্খলা যে, কোনো বিদেশী পথিক, সঙ্গে যার প্রচুর সোনা-দানা, ক্লান্ত হয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন পথের মাঝখানে কোথাও, একটা কুটোও চুরি যাবে না তাঁর। তবে তাঁকে ঘুমোতে হবে রাজপথের উপরে। রাজপথ থেকে দূরে অন্য কোথাও ঘুমোলে বরং শাস্তিই জুটবে তাঁর কপালে।

মার্কো পোলো এরপর গিয়েছিলেন মাবার থেকে হাজার মাইল দূরে মতুপল্লীতে। এখন এ জায়গার নাম তেলেঙ্গানা। কৃষ্ণা আর গোদাবরী নদীর মাঝখানে এই শহর। তবে মার্কোর হিসেবটা ভুল। দূরত্বটা হাজার মাইল নয়, তার অর্ধেকের মত। তখন এই শহরের শাসনকর্ত্রী রাণী রুদ্রমা দেবী। এই রাজ্যে মাছ, মাংস, শস্য, দুধ পাওয়া যায় প্রচুর। মাটির তলায় হীরের খনি। এঁরা যে সুতোর পোশাক তৈরি করেন তা অপূর্ব। পৃথিবীর যে কোনো দেশের রাজা বা রাণী এই রকম এক প্রস্থ কাপড় পেলে খুশিতে ডগমগ না হয়ে পারতেন না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের ভেড়া এখানে অজস্র।

এরপর মহীশূরের কথা। মার্কো পোলোর লেখায় এর নাম লার। এটা ব্রাহ্মণদের জন্মভূমি। তাঁরাই এদেশের শ্রেষ্ঠ বণিক। জীবনে মিথ্যা কথা বলেন না তাঁরা। ভীষণ ধার্মিক। অপরের কোনো জিনিসের প্রতিই লোভ নেই তাঁদের। কখনো প্রাণীহত্যা করেন না। রাজ্যের যিনি রাজা তিনি ধনবান। মাবার বা চোল থেকে রাজা কিনে আনেন মণিমুক্তো ঐ সব ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীদের মারফৎ। এই সব ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু। এর কারণ তাঁদের খাওয়া-দাওয়া অল্প। আর সংযমী। এঁদের মধ্যে যাঁরা যোগী, তাঁদের কারো কারো পরমায়ু ১৫০ থেকে ২০০ বছর।

গুজরাটে পৌঁছে তিনি দেখেছিলেন বিরাট বন্দর। এখানে জলদস্যুদের বড় উৎপাত। তারা জাহাজ ঘিরে লুটপাট করে। কিন্তু জাহাজের লোকদের মারে না। ছেড়ে দেবার সময় বলে, যাও, আবার বাণিজ্য করে নিয়ে এসো জাহাজ বোঝাই জিনিসপত্র। আমরা আবার এসে কেড়ে নিয়ে যাব।

গুজরাট একটা বিরাট শহর। আবার বন্দর। এখান থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে জিনিসপত্র চালান যায় বিদেশের হাটে-বাজারে।

ইবন বতুতা আসলে একজন পর্যটক। অনেকে মনে করে তিনি বুঝি আরব দেশের মানুষ, তা কিন্তু নয়। তিনি আফ্রিকার মানুষ। তানজিয়ার নগরের লোক। পুরো নাম, আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ ইবন বতুতা। আরও দুটো ডাক নাম ছিল তাঁর। স্যামসুদ্দীন আর মওলানা বদরুদ্দীন। দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবী দেখতে, বয়েস যখন মাত্র একুশ। সময়টা ছিল ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দ। পৃথিবীর এদেশ সেদেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন পৌঁছে গেলেন দিল্লিতে। দিল্লির সিংহাসনে তখন তুগলঘ বংশের তুর্কি সুলতান মহম্মদ বিন তুগলঘ। সুলতান হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন বিদেশীকে। বসবাসের জন্য করে দিলেন আরামের ব্যবস্থা। আর কিছুদিন পরেই দিল্লির দরবারে পেয়ে গেলেন কাজি বা বিচারপতির পদ। প্রায় আট বছর ছিলেন এই সম্মানের পদে। তারপর ১৩৫২-এ সুলতান একদিন ডেকে বললেন,

—আপনাকে যেতে হবে চীন দেশে।

—কেন ?

—আমার দূত হয়ে। আমি ঐ দেশের সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়তে চাই।

চীনের পথে পা বাড়াবার সময়ই ভারতবর্ষের বহু জায়গা দেখা হয়ে গেল তাঁর। চোখও ছিল তাঁর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখার। ভারতবর্ষ থেকে দেশে ফিরেছিলেন ১৩৫৩-য় অর্থাৎ পুরো ২৮ টা বছর ধরে এদেশে থেকে এদেশের নাড়ী নক্ষত্র দেখেছেন। দেশে ফিরে দু-বছর পরে লিখে ফেললেন নিজের ভ্রমণকাহিনী! তার নামটা বিরাট। তুহ্‌ফাৎ-উন্‌-নুজ্‌জার ফী ঘরাইব্‌-ইল-অমসার-ওয়া-অজাইব-ইল-অফসার। কিন্তু এর একটা সংক্ষিপ্ত নামও ছিল। রেহালা। মানে ভ্রমণকাহিনী।

ইবন বতুতার ভ্রমণকাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি ভারতবর্ষের অনেক খবর। মহম্মদ বিন তুগলঘের আগে-পরে দিল্লির রাজদরবারের খবরও সেখানে অনেক। মহম্মদ বিন তুগলঘকে তিনি এঁকে গেছেন নিখুঁত করে। বতুতার চোখে একই সঙ্গে তিনি দেবতা এবং দানব। একই সঙ্গে দয়ার সাগর আবার নৃশংস শাসক। তাঁর রাজধানীর তোরণদ্বারে সব সময়েই ভিখারির ভিড় আর রক্তাক্ত মানুষের পাহাড়, যাদের হত্যা করেছেন তিনি। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট। হাতের লেখা চমৎকার। স্মৃতিশক্তি প্রখর। ব্যাক্তিগত জীবন পবিত্র। নিষ্ঠাবান মুসলমান। দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, গণিত এসবে দক্ষ। জানতেন চিকিৎসা। জানতেন অনেক ভাষা। কিন্তু দোষের মধ্যে একটাই ছিল সাংঘাতিক, রেগে যেতেন হঠাৎ। আর রেগে গেলেই এই ন্যায়পরারণ মানুষটা হয়ে উঠতেন নরখাদক। তাঁর সময়ে দেশে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মিলন ছিল না মনের। তবে সুলতানের দরবারে হিন্দু রাজকর্মচারী ছিল। একবার একজন হিন্দু প্রজা স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে নাশিশ জানিয়েছিল কাজির কাছে। সুবিচারও পেয়েছিল। সুলতান শ্রদ্ধা করতেন হিন্দু যোগীদের। একবার এমন হল যে, কোনও একজন যোগী তাঁর সব অলৌকিক

কাণ্ড-কারখানা দেখাচ্ছিলেন সুলতানকে। ইবন বতুতা ছিলেন সঙ্গে, দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বতুতা।

সুলতান কী রকম ছটফটে মাথা গাগলা মানুষ ছিলেন তারও ছবি আঁকা আছে বতুতার বিবরণে। একবার ঠিক করলেন দিল্লি থেকে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যাবেন দেবগিরি। দেবগিরির নতুন নামও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, দৌলতাবাদ। হুকুম জারি হয়ে গেল, দিল্লির সমস্ত লোককে চলে যেতে হবে দৌলতাবাদে। দিল্লি জুড়ে তখন হাহাকার। একি সর্বনাশ! এতদিনের ঘর সংসার ছেড়ে হুট করে ভিন দেশে চলে যাওয়া যায় নাকি। অথচ যেতে হবে। না গেলে হাতে মাথা কাটবে সুলতান। অর্ধেক চলে গেছে, বাকি অর্ধেক যাবে-যাবে। এই রকম সময়ে আবার হুকুম জারি হল, না, দৌলতাবাদ থেকে ফিরে এসো দিল্লিতে।

দিল্লি থেকে চীন যাবার পথে তিনি দেখেছেন চাঁট গা, সোনার গা, শ্রীহট্ট। আর তাঁর ভ্রহণকাহিনীতে বাংলাদেশের বিবরণ ভুরি ভুরি। বাংলাদেশের তিনি নাম দিয়েছিলেন দোজখ-ই পুর-নিমৎ। এর মানে হল, প্রাচুর্যের নরক। প্রাচুর্য যদি, তাহলে আবার নরক কেন? নরক-এর জন্যে দায়ী হল জলহাওয়া। এদেশের আর্দ্র জলবায়ু সহ্য হত না তাঁদের মতো বিদেশীর। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের মতো শস্যের কম দাম আর কোথাও নেই পৃথিবীতে। বিশাল এই দেশ। ধান ফলে প্রচুর।

তাঁর সময়ে চাল ডাল বা জিনিসপত্রের দাম শুনলে মনে হবে এ বুঝি রূপকথা। সত্যিই কখনো এমন সোনার দেশ ছিল নাকি?

একমণ চাল—এখনকার ১২ পয়সা

একমণ ঘি—১৪৫ পয়সা

একমণ চিনি—১৪৫ পয়সা

একমণ তিল তেল—৭৩ পয়সা

১৫ গজ দামি কাপড়—২০০ পয়সা

একটা দুধেলা গাই—৩০০ পয়সা

একটা মুরগি—২০ পয়সা

একটা ভেড়া—২৫ পয়সা

ইবন বতুতা একজন বাঙালি মুসলমানের মুখে শুনেছিলেন যে, তিনি, তাঁর স্ত্রী আর একজন চাকর এই তিনটে মানুষের খাওয়া-দাওয়ার সারা বছরের খরচ এক টাকা। বাংলাদেশে তখন মানুষও বিক্রি হতো। একটা সুন্দরী মেয়ের দাম ৭০ টাকা। স্বাস্থ্যবান ছেলের দাম ১৫০ টাকা। ইবন বতুতা নিজেও কিনেছিলেন একটি সুন্দরী বালিকা। নাম অশূরা। তাঁর একজন সঙ্গী কিনেছিলেন লুলু নামের এক বালককে।

বাংলাদেশের প্রথম যে শহরে পা পড়েছিল তাঁর, তার নাম সোদকাওয়াঙ। অর্থাৎ চট্টগ্রাম। কাছেই গঙ্গা নদী। নদীতে দেখেছেন অসংখ্য নৌকো আর জাহাজ। বাংলার সুলতান তখন ফখরুদ্দীন। ডাকনাম ফখরা। ঐ সব জাহাজে চেপেই তিনি যুদ্ধ করতে যেতেন লখ্‌কৌতির সঙ্গে। বতুতার খুব ভালো লেগেছিল সুলতানকে। বিদেশী বণিক, সুফী আর ফকিরদের ইনি শ্রদ্ধা করতেন। একবার তো একজন ফকিরকে তিনি নায়েব করে দিলেন চট্টগ্রামের। তবে দুঃখের কথা হল, নায়েব হয়েই বদলে গেলেন ফকির সাহেব। সুলতানের একমাত্র ছেলেকে হত্যা করে সুলতানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন তিনি। অবশ্য পরে সুলতানের হাতেই গর্দান থেকে মাথাটা কাটা পড়েছিল তাঁর।

ইবন বতুতা চট্টগ্রাম থেকে গিয়েছিলেন কামরূপ। সেখানে পাওয়া যায় কস্তুরীমৃগ। এখানকার মানুষেরা যাদুবিদ্যা, ভোজবাজিতে খুব পটু। বতুতা তুর্কিদের সঙ্গে ওখানকার পাহাড়ি জনসাধারণের খুব মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ, তারা খুব পরিশ্রমী। বতুতা যে কামরূপ পর্বতমালার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, সেটার পেছনে মূল কারণ ছিল শেখ জানালুদ্দীন নামের একজন সাধুকে দেখা। দেড়শো বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। পরপর দশ দিন ধরে অনশন। এইভাবে চল্লিশ বছর উপবাসে কাটিয়েছেন। উপবাস ভাঙতেন নিজের পোষা

গরুর দুধ খেয়ে। সারারাত শালগাছের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন তিনি।

শেখ জালালুদ্দীনের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি চলে এলেন হবঙ্ক শহরে। তাঁর মতে এটাই নাকি বাংলার সবচেয়ে গৌরবের শহর। আর তেমনিই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যেতে হয় নদীর উপর দিয়ে। নদীর নাম, নহর-উল-অজবক। মানে নীল নদী। বতুতার মনে হয়েছিল যেন মিশরের নীল নদই। দুপাশে তেমনি সারি সারি জল তোলার যন্ত্র। তেমনি নয়নাভিরাম গ্রাম, তেমনি চোখ-জুড়োনো ফল-ফুলেব বাগান। পনের দিন ধরে এই নদী পেরিয়েছিলেন তিনি। পথে পড়ল বাজার। বাজারের সামনে নদীতে অনেক নৌকা। দুটো নৌকো মুখোমুখি হলেই বেজে ওঠে ঢোল। এইটেই হচ্ছে তাদের পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা। সুলতান ফখরুদ্দীনের হুকুম ছিল, নদীতে কোন সময়েই ফকিরদের কাছ থেকে ভাড়া চাওয়া চলবে না। উল্টে, যাঁরা ক্ষুধার্ত তাঁদের সেবা করতে হবে খাইয়ে-দাইয়ে। শহরে কোনো ফকির এলে তাঁকে ভিক্ষে দিতে হত আধ দিনার।

পনের দিন ধরে নদী পেরিয়ে ইবন বতুতা পৌঁছেছিলেন সুনার-কাওয়াঙ-এ, অর্থাৎ সোনার গাঁ-এ। সোনার গাঁ-এর বন্দরেই তিনি চেপেছিলেন জাস্কে। জাঙ্ক মানে চীন দেশের এক রকমের বড় জাহাজ। সেই জাহাজে চেপেই ইবন বতুতা পাড়ি দিয়েছিলেন সুমাত্রায়।

ইবন বতুতা দেখেছেন, সমাজের অভিজাত গৃহস্থেরা—যেমন নারী, তেমনি পুরুষ, সকলেই যাতায়াত করে চতুর্দোলায় চেপে। মেয়েদের চতুর্দোলায় ঝোলে সিল্কের পর্দা। পান খাওয়াটা ঘরে-ঘরে প্রথার মতো। পানের রঙে সকলেরই ঠোঁট রাঙা। পান খেতেন সুলতানও! সুলতান যদি কোনো অতিথিকে পান উপহার দিতেন, সেটা হতো তাঁকে দারুণ সম্মান জানানো। সোনা বা দামি পোশাক দিয়ে সম্মান জানানোর চেয়ে এই পান উপহার দেওয়ার মূল্য অনেক বেশি। পান হাতে পেলেই সেটা মুখে পুরে দেওয়াটা নিয়ম ছিল না। প্রথমে খুঁটে নিতে হবে সুপুরি, পানটা খুলে। তারপর পান খাওয়া।

তারপর চুন। পান খেলে হজমের শক্তি বেড়ে যায় দুগুন, এই জন্যেই পানের চলন ঘরে ঘরে।

বাংলাদেশের যে-সব ফল চোখে পড়েছে বতুতার, তার মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কমলালেবু, আঙ্গুর ডালিম, নারকেল। তৈরী করা খাবারের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু ছিল, চাপাটি, পরটা, শিককাবাব।

বাংলাদেশে সতীদাহ চোখে পড়েছিল ইবন বতুতার। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সতী-নারীর প্রচণ্ড মনোবল দেখে।

একজন সতীর স্বামী মারা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই সংবাদ পেয়ে সেই সতী স্নান করে নিজেকে সাজালেন সবচেয়ে দামি শাড়ি-গয়নায়। তারপর ঘোড়ায় চড়ে, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আর আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে চললেন সেইদিকে। যেখানে সাজানো হয়েছে চিতা। তাঁর একহাতে একটা নারকেল। অন্য হাতে একটা আয়না। সকলের আগে চলেছে বাজনদারের দল। চিতা সাজানো হয়েছে গাছের ছায়ায়। তার একদিকে একটা মন্দির। অন্যদিকে পুকুর। চিতার জায়গাটা পর্দা দিয়ে ঘেরা। যাতে কেউ দেখতে না পায়। চিতার কাছাকাছি এসে সতী আবার স্নান করলেন সেই পুকুরের জলে। তারপর একটা সাধারণ মোটা শাড়ি পরে নিজের দামি শাড়ি আর সোনার দামি দামি গয়নাগাটি সব বিলিয়ে দিলেন অন্যদের। তারপর তিনি প্রার্থনায় বসলেন চিতায় প্রাণ দেওয়ার আগে।

এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বতুতা।

বতুতার বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও অনেক খবর। যেমন সুলতানদের সৈন্য ছিল দু'ধরনের। পদাতিক আর অশ্বারোহী। ছিল গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগ। প্রত্যেক শহরে থাকত কাজি। দেশের মানুষের যা কিছু নালিশ সব জানাতে হত এই কাজির কাছে। এর জন্যে কোনো পয়সা লাগত না। এমনকি স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধেও যদি কারো নালিশ থাকত, তাও জানাতে হত এই কাজির কাছে।

সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো যোগী বা তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের।

তাদের দেওয়া কবচে বা তুক্‌তাক্‌ ওষুধে অনেক কঠিন অসুখও সেরে যেত বলে সাধারণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল তাদের সম্বন্ধে।

দেশের মানুষেরা কাজ করত নানা রকমের। তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার। কেউ গণৎকার। কেউ চাষী। কেউ ব্যবসায়ী। কেউ ঠিকেদার। কেউ কাজ করে রাজার বিভাগে। কেউ বা সেনা বিভাগে।

ঐ সময়কার বাংলাদেশের মসলিন ছিল বিখ্যাত। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে তার নামডাক খ্যাতি। বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় অনেকগুলো মসলিন কিনেছিলেন তিনি।

আল বেরুনী

সুলতান মামুদের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। গজনির সুলতান। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রীস্টাব্দ, এই ২৭ বছরের ভিতরে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন ১৭ বার। তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটেছেন হিন্দুদের। যেখানে যত হিন্দুর মন্দির, দেব-দেবীর মূর্তি, সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে লুটিয়ে দিয়েছেন ধুলোয়। মন্দির থেকে লুটপাট করেছেন সোনা-দানা, হীরে-মুক্তো। মণি-মুক্তোর উপর এত লোভ ছিল তাঁর যে, যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের গলা থেকে মণি-মুক্তো বসানো হারটা ছিনিয়ে নিতেও লজ্জা করত না তাঁর। অথচ ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মানুষটা ছিলেন শিক্ষা বা সাহিত্যের অনুরাগী। সেই সঙ্গে বুদ্ধিমান। আবার ধর্মভীরু। কিন্তু সব কিছুকে মুছে দিয়ে তাঁর যে পরিচয়টা আজ সবার কাছে বড়, সেটা হল এক নির্দয় আর হৃদয়হীন শাসকের।

তাঁর মৃত্যুর দুশো বছর পরে কবি শেখ শাদী একদিন একটা ছোট্ট কথিকা শুনিয়েছিলেন তাঁর অনুরাগীদের। এই ছোট্ট কথিকাটি শুনলে

বুঝতে পারবে, মুসলমানরাও কী পরিমাণ ঘৃণা ও লজ্জা পেয়ে থাকে স্থলতান মামুদকে নিয়ে।

"একজন লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন স্থলতান মামুদের শবদেহ শুয়ে আছে কবরে। কেবল তাঁর চোখের তারা ছুটো তখনও জীবন্ত। ক্রমাগত ঘুরছে এদিক ওদিক। তাই দেখে লোকটা জিজ্ঞেস করল,কী খুঁজছেন আপনি ? উত্তর এল, মরবার আগে আমি অনেক ধনরত্ন রেখে এসেছিলাম। সেগুলো কোথায় কী ভাবে আছে দেখতে চাইছি।"

সেই স্থলতান মামুদ তাঁর ছুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন খোরাজেম। খোরাজেম-এর রাজধানীর নাম উরগেঞ্জ। সোভিয়েত দেশের তুর্কমেনিস্তান আর উজবেকিস্তান-এর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। নাম আমুদরিয়া। তারাই ধারে খোরাজেম। সেখানে রাজত্ব করতেন মামুনি রাজবংশ। এঁরা ছিলেন বোখারায় সামানি সম্রাটদের অধীনে।

একসময়ে খোরাজেমে দেখা দিল বিদ্রোহ। হত্যা করা হল দেশের স্থলতানকে। রাজ্য জুড়ে অশান্তি। সিংহাসন মিয়ে ষড়যন্ত্র। এই স্থযোগে, শ্মশানের উপর যেমন করে কালো ডানা আর লাল ঠোঁট নেড়ে, নখ বাগিয়ে নেমে আসে শকুন, ঠিক তেমনি করেই স্থলতান মামুদ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খোরাজেম-এর উপর। খোরাজেম চলে গেল গজনির সাম্রাজ্যের ভিতরে। ফেরার পথে স্থলতান চলেছেন বিজয়গর্বে। পিছনে একদল বন্দী। বন্দীদের মধ্যে আছে সৈন্য। আছে রাজ্যের বহু গণ্যমান্য নাগরিক, আছে মামুনি বংশের রাজপুত্রেরা। আছে কিছু পণ্ডিত ধরনের মানুষ। আর সেই বন্দী পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন ৪৪ বছরের একজন জ্ঞানী পুরুষ। নাম, আল বেরুণী।

ইরানি পরিবারের ছেলে। জন্মেছিলেন ৯৭৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে। খোরাজেমের ফার্স নামের এক শহরতলিতে। যেহেতু এঁরা বিদেশী, তাই এঁদের বলা হত, বেরুণী। মার্সি বেরুণী শব্দের মানে, বহিরাগত।

আল বেরুণীর পুরো নাম, আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ। সংক্ষেপে ডাকা হতো আবু রায়হান। আবার কখনো আল বেরুণী। ১৯৭৩ সালে পূর্ণ হয়েছে তাঁর জন্মের হাজার বছর। আর সেই উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান 'ফার্স'-এর নাম বদলে রাখা হয়েছে 'বেরুণী'।

পাছে এইসব বন্দী রাজপুত্রেরা দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ এঁটে নিজেদের রাজ্যটা সুলতানের কাছ থেকে আবার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে সেই ভয়ে সুলতান করেছিলেন কি, বিভিন্ন ধরনের বন্দীকে রেখে দিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। মামুনি বংশের রাজপুত্রদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের পাঞ্জাব আর সিন্ধুপ্রদেশের দুর্গে। সামরিক বন্দীদের ভর্তি করে নিয়েছিলেন নিজের সেনাবাহিনীতে। বিশিষ্ট নাগরিকদের রেখেছিলেন নিজের রাজ্যে। তবে বন্দী না হলেও নজরবন্দী সবাই। স্বাধীন ভাবে যেখানে খুশি হাঁটবে যাবে, সে পথে কাঁটা। আর বেরুণীর তখন জ্যোতির্বিদ হিসেবে খুব নাম-ডাক। তাই মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়ত সুলতানের দরবারে। সেখানে জুটত খানিকটা খাতির-যত্ন। আবার অনেক সময়ে চাবুকও পড়তো পিঠে। নির্যাতন করা হত নানা ভাবে। সুলতান যাবেন যুদ্ধে। আল বেরুণীকেও নিয়ে নেওয়া হত সঙ্গে। থাকতে হত সৈন্যদের সঙ্গে। এইভাবেই, কিংবা মামুনি রাজপুত্রদের সহবন্দী হিসেবে, তাঁর ভারতে আসা। পাঞ্জাব আর সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটা অঞ্চলে থাকার সময় এখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর। সংগ্রহ করেছিলেন ভারতীয় ভাষার পুঁথিপত্র। অবশ্য গজনিতেও তখন আসা-যাওয়া ছিল ভারতীয় পণ্ডিতদের। এমনকি সুলতান মামুদের সেনাবাহিনীতেও একাধিক সেনানায়ক ছিলেন হিন্দু। সুলতানের পছন্দ নয় জেনেও, একেবারে একার চেষ্টায় ভারতবর্ষকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাই সুলতানের কাছ থেকে উৎসাহ পান নি কোনো সময়েই। তাই সুলতানের প্রতিও নিজের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন নি কোনদিন। আর বেরুণীর মতন

শিক্ষিত এবং রুচিবান মানুষের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব ছিল না একজন নির্দয় শাসক, নিষ্ঠুর রাজনীতিজ্ঞ, লোভী আর গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া। প্রশংসা তিনি করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে লুকিয়ে থেকেছে মনের বিরক্তি, ঘৃণা আর বিদ্রূপ।

"ইসলামের দৃঢ়তম স্তম্ভ, আদর্শ সুলতান, পৃথিবীর কীর্তিমান মানুষ মামুদকে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন।"

যতদিন সুলতান বেঁচে ছিলেন, আল বেরুণী হাত লাগান নি ভারতবর্ষ নিয়ে বই লেখায়। সুলতানের মৃত্যুর পাঁচ মাসের মধ্যেই সে-বই লেখা শেষ। সিংহাসনে তখন মামুদের ছেলে মাসুদ। মাসুদ কিন্তু বাবার একেবারে উল্টোপিঠ। তিনি দরাজ-দিল মানুষ। গুণীজনদের প্রতি গভীর তাঁর শ্রদ্ধা। নিজেও বিদ্যোৎসাহী। আল বেরুণীর জীবনে এবার লাগল সুদিনের হাওয়া। এতদিন ছিলেন যেন আলোবাতাসহীন কোনো বদ্ধ ঘরে। এবার ফিরে পেলেন মুক্ত পৃথিবী। সুলতান মামুদকে নিজের লেখা কোনও বই উৎসর্গ করেন নি তিনি। কিন্তু সুলতান মাসুদকে করলেন। এবং এরজন্য প্রচুর টাকা উপহার পাঠিয়েছিলেন মাসুদ। আল বেরুণী তা স্পর্শ করেন নি। তাঁর জীবন যাপন ছিল সহজ, সরল, পবিত্র। সপ্তাহে মাত্র একদিন বেরোতেন শহরে, নিজের আহার্যের খোঁজে। বাকি সবটা সময় প্রাচীন মুনি-ঋষির মত তপস্যায় মগ্ন। তাঁর তপস্যা ছিল পড়া আর লেখা।

মধ্যযুগের এক মহান প্রতিভাধর ছিলেন তিনি। একটা মানুষের মধ্যে অসংখ্য প্রতিভাবান মানুষ জড়ো হয়েছিল যেন। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ, সাহিত্যিক, ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, ভেষজবিদ, কবি এবং দার্শনিক। শুধু বিজ্ঞান নিয়েই লিখেছেন তিনি বারো হাজার পাতা। বছরের দুটো পরবের দিন বাদ দিলে বাকী সারা বছরের প্রত্যেকটা মুহূর্তই তিনি ডুবে থাকতেন কাজে।

অল্প একটু মোটাসোটা, মাঝারী মাপের এই মানুষটির গায়ের রঙ

ছিল চকচকে, ব্যবহার মাজা-ঘসা আর অমায়িক, কিন্তু সত্যের ব্যাপারে শক্ত, নির্ভীক আর স্পষ্টবাক। সারা জীবনে বই লিখেছেন কত, তার সত্যিকারের হিসেব-নিকেশ শেষ হয় নি এখনো। তবে অনুমান করা হয় সংখ্যাটি হচ্ছে ১৮০। তারই মধ্যে একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম, ভারততত্ত্ব। এটা সোজা করে বলা। মূল আরবী নামটা অনেক বড়। যার বাংলা করলে দাঁড়াবে—

"বুদ্ধির বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর যা গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সেই সব পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা।"

তাঁর সমসময়ের ভারতবর্ষকে জানবার পক্ষে এই বই এখন একটা মূল্যবান দলিল। বিরাট বড় সেই বই। জটিল প্রসঙ্গগুলোকে বাদ দিয়ে, সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যা লিখে গেছেন, এখন শুধু তার দিকেই চোখ ছড়াবো আমরা।

তখনকার ভারতীয় হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা—

"এরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তাঁদের দেশই শ্রেষ্ঠ, মানবজাতির মধ্যে তাঁরাই সর্বোত্তম, রাজাদের মধ্যে তাঁদের রাজারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্মের মধ্যে তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। মূর্খের মতো নিজেকে বড়ো ঘোষণা করে, নিজেকে জাহির করে ওঁরা পরম পরিতৃপ্ত। জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য করা ওঁদের স্বভাব।"

আল বেরুণী তখনকার হিন্দুদের সমালোচনা করেছেন অনেক। ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি অকপটে বলতে পেরেছিলেন এমন স্পষ্ট কথা। তিনি দেখেছিলেন, হিন্দুরা শরীরের কোন চুল কাটে না। মাথা ভর্তি চুল দিয়ে ওরা মাথাটাকে বাঁচায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে। গোঁফ রাখে প্রায় সকলেই। তাতে তা দেয়। গায়ে পোশাক নেই বললেই হয়। দেখতে অনেকটা উলঙ্গের মতো, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। রাখে বড় বড় নখ। আর তার জন্যে খুব গর্ব। খেতে বসে গোবর দিয়ে নিকানো একটা জায়গায়, আলাদা আলাদা।

ভোজনপাত্রগুলো মাটির বলে খাওয়ার পরই ফেলে দেয়। খাওয়ার পরই পান-গুয়া খেয়ে লাল করে নেয় দাঁত। হিন্দুরা গো মাংস খায় না। কিন্তু গোমূত্র খায়। করতাল বাজায় কাঠি দিয়ে। কখনো কখনো মাথার পাগড়ীকে ব্যবহার করে পাজামার মতো। সত্যিকারের পাজামাটা হয় প্রকাণ্ড। তাঁর বাঁধন থাকে পিছন দিকে। জুতো পরে পায়ের সঙ্গে এঁটে। জুতোর মুখটা থাকে উপর দিকে উল্টানো।

তাঁর ধারণায় ভারতবর্ষ এককালে ছিল সমুদ্র। তিনি লিখেছেন—

"তুমি যদি ভারতের মাটি নিজের চোখে দেখ, আর এদিকে-ওদিকে খুঁড়ে তার ভিতর থেকে যে গোল পাথরের নুড়ি খুঁজে পাবে তার দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে এই ভারতবর্ষ এককালে ছিল সমুদ্র, নদীর পলিমাটি জমে জমে ক্রমশ তা ভরে গেছে।"

তিনি দেখেছেন, সতীদাহ। দেখেছেন, পুরুষেরা স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে চারবার। তারপর আর করা চলে না। আইনের নিষেধ। তবে চারজন স্ত্রীর একজন মারা গেলে করতে পারে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে কোনো স্ত্রী অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে না। তখন তার সামনে দুটো পথ। এক, আমরণ বিধবা হয়ে থাকা। দুই, স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মরা।

হিন্দুদের আরও একটা মজার গুণ চোখে পড়েছিল তাঁর। যে-সব জায়গার বিশেষ কোন রকম মাহাত্ম্য আছে, সেখানে তারা স্নানের জন্য কুণ্ড বা জলাশয় তৈরি করে। আবার এই সব নির্মাণ করে এমন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে, যা মুসলমানদের পক্ষে করা তো দূরের কথা, বর্ণনাও করতে পারবে না। হিন্দুদের মধ্যে অনেক বড় গুণ আছে। কিন্তু ওদের মধ্যে সক্রেটিসের মতো মহাজ্ঞানী নেই। হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা তাই এলোমেলো। সেই কারণেই কিছু বলতে গেলে এরা ব্যবহার করে বিরাট বিরাট সংখ্যা, ধারণা করে অতিরিক্ত দীর্ঘকাল। আর এসবের কোনো প্রতিবাদ সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। আরো একটা দোষ, একই জিনিসকে বহুনামে ডাকা, এদের

ভাষায় সূর্যের সহস্র নাম। এদের ধারণা সূর্য আছে মোট ১২টি। প্রত্যেক মাসে এক একটি উদয় হয়। এদের ভাষা এত বেশী শব্দ বহুল যে, কোন লোককে যদি এই ভাষা আয়ত্ত করতে হয়, তাহলে তার সারা জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। এদের ছন্দের জ্ঞান বা ছন্দের কানটা খুব ভাল। সব বইই এখানে লেখা হয় ছন্দে। হিন্দুরা উপবাস করে ঈশ্বর অথবা দেবতার নামে। এক মধ্যাহ্ন থেকে আর এক মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উপবাস করার নাম, একনক্ত। পূর্ণিমার দিনের উপবাসের নাম, চন্দ্রায়ণ।

হঠাৎ মনে হতে পারে, আল বেরুনী হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ থেকেই তাদের এই রকম খুঁত খুঁজে বেড়িয়েছেন। তা কিন্তু নয়। তিনি ছিলেন সত্যবাদী আর যুক্তিপ্রবণ। তিনি যে কতখানি সৎ তার প্রমাণ মিলবে, সুলতান মামুদের মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধার বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে থেকেও তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন তাঁর চরম প্রতিবাদ ও ঘৃণা।

"তিনি হিন্দুদের শস্যশ্যামল অঞ্চলগুলিকে করেছিলেন মরুভূমি। আর এমন সব কৃতিত্ব দেখালেন যাতে উড়ন্ত ধূলিকণার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল হিন্দুরা। নিহত হতে হতে বেঁচে রইল যারা তাদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষটা হয়ে উঠল বদ্ধমূল। তারা পালিয়ে গিয়ে কাশ্মীর বা বারানসীর এমন সব জায়গায় আত্মগোপন করল, যেখানে হাত পৌঁছয় না আমাদের।"

হিন্দুদের গোঁড়ামি অথবা সংস্কারের কথা বলার পরেই তিনি কত অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আরবদের মধ্যেও রয়েছে এই রকম বা এর চেয়ে বেশী কুসংস্কার। তারা হিন্দুদের মত পরিচ্ছন্ন নয়। অনায়াসে নোংরা অথবা মৃত পশুর মাংস খেতেও লজ্জা নেই তাদের।

আল বেরুণীর ভারততত্বে রয়েছে ৮০টা অধ্যায়। ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, শ্রেণীভেদ, স্বর্গনরকের ধারণা, জন্মান্তর-বাদ, মূর্তিপূজা, বর্ণমালা, গ্রহ-নক্ষত্র, মরু-পর্বত, ব্রত-উপবাস, আইন-আদালত, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, সব কিছু নিয়েই লিখেছেন তিনি। তাঁর

এই সব রচনা পড়ে ভারতীয় জ্ঞানীরা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন আর গণিতের পণ্ডিতরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বারবার। বারবার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ আর অভিমত চেয়েছেন তাঁর কাছে। কারণ তাঁরা জানতেন, আল বেরুনী এমন মানুষ, যাঁর কাছে সত্যের চেয়ে আর কিছু বড় নয়।

আল বেরুনী বেঁচে ছিলেন পঁচাত্তর বছর। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ১০৪৮-এ মৃত্যু। এই পঁচাত্তর বছরের প্রায় প্রত্যেকটা দিনই ছিল তাঁর জীবনে কর্মময়। তিনি চর্চা করেন নি এমন বিষয় নেই বললেই চলে পৃথিবীতে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাস, গণিত, তারিখ-গণনাবিদ্যা, গাণিতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, সবই যেন তাঁর নখদর্পণে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আসল এবং অনুবাদ মিলিয়ে মোট রচনার সংখ্যা কুড়ির মতো। তা ছাড়া লিখেছেন প্রচীন ভারত ও ইরানের সভ্যতার নানান লৌকিক কাহিনী।

তাঁর রচনা থেকেই ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে তাঁর মতামতের অংশবিশেষ তুলে ধরছি এখানে। গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপুজোর মতো। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরই রচনার উদ্ধৃতি। এ ছাড়া তাঁর জ্ঞানের, অনুসন্ধানের, মনের বিরাটত্বকে ধরবার বুঝবার আর কোন পথই বা খোলা?

"হিন্দুদের দেশের দক্ষিণ প্রান্তে খেজুর আর নারকেলের মতো পাতলা গাছ আছে এক রকম। এতে জন্মায় খাওয়ার সুস্বাদু ফল আর সেই সঙ্গে এক গজের মতো লম্বা আর তিন আঙুলের মতো চওড়া পাতা। হিন্দুরা এই পাতাকে বলে তাড়ী বা তাল পাতা। এবং এই পাতায় তারা লেখে। পাতার মাঝখানে একটা ফুটো করে প্রত্যেকটা পাতাকে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে ফুটোর মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে সমস্তটাকে বেঁধে রাখে। মধ্য আর উত্তর ভারতের লোকেরা এই লেখার জন্যে ব্যবহার করে তূজ গাছের ছাল, এ হল সেই জাতের গাছ যা থেকে তৈরী হয় ধনুকের আচ্ছাদন। একে

বলা হয়ে থাকে ভূর্জ পত্র। এক গজ লম্বা আর বিঘত চওড়া করে এগুলোকে কেটে, শক্ত আর মসৃন করার জন্যে তেল মাখিয়ে পালিশ করে ব্যবহার করা হয় লেখার কাজে। একটুকরো কাপড়ে মুড়ে, দুটো ফলকের মধ্যে এঁটে বেঁধে রাখে। তারা একে বলে পুঁথি। তূজ গাছের ছালের উপরে তারা চিঠিপত্র বা অন্য দরকারী লেখাও লেখে।"

"হিন্দুদের সংখ্যা গণনা এক হাজারের চেয়ে বেশি, তাদের পাটিগণিতের নিয়ম অনুযায়ী। হয়তো স্বাধীনভাবেই তারা এসব আবিষ্কার করেছিল, নয়তো বিশেষ কোনো শব্দতত্ত্ব থেকে সন্ধান পেয়েছিল। পরে মিলন ঘটে দুটোর। ধর্মীয় কারণেই সংখ্যাক্রমের ধারাবাহিকতায় আঠারো ধাপ পর্যন্ত গ্রহণ করেছে তারা। তাদের ব্যাকরণবিদেরা শব্দতত্ত্ব দিয়ে এব্যাপারে সাহায্য করেছেন তাদের গণিতবিদ্‌কে। এই আঠারোটা ধাপ হচ্ছে এই রকম—

১। একম্ ২। দশম ৩। শতম ৪। সহস্রম ৫। অযুত ৬। লক্ষ ৭। প্রযুত ৮। কোটী ৯। ন্যার্বুদ ১০। পদ্ম ১১। খর্ব ১২। নিখর্ব ১৩। মহাপদ্ম ১৪। শঙ্কু ১৫। সমুদ্র ১৬। মধ্য ১৭। অন্ত্য ১৮। পরার্ধ।

কোনো কোনো হিন্দুর ধারণা পরার্ধ-র পরও আছে আরও একটা ধাপ, তার নাম ভূরি। আর সেইখানে পৌছেই সংখ্যা গণনা শেষ।"

রসায়ন নিয়ে অনেক মজার কাহিনী, রূপকথার মতো শুনতে, সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে ব্যাদি নামের একজন লোক রসায়নের চর্চায় ব্যয় করেছিলেন জীবনের সমস্ত সম্পদ। অনেক চেষ্টার পর তিনি নাকি আবিষ্কার করেছিলেন এমন মলম, যা মাখলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য। মলম মেখে অদৃশ্য হওয়ার পরীক্ষাও করেছিলেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বাতাসে ভাসতে ভাসতে একদিন এ খবরটা গিয়ে পৌছল রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে। তিনি ছুটে এলেন নিজের চোখে সত্যি-মিথ্যার যাচাই-এ। রাজাকে দেখে ব্যাদি বললেন; আপনি হাঁ করে আমার থুতু আপনার মুখের মধ্যে নিন।

রাজা বিরক্তভরে সে থুতু মুখে নিতে রাজী হলেন না। ব্যাদির মুখের থুতু ছিটকে পড়ল ঘরের চৌকাঠের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে গেল সে চৌকাঠ। নিজেদের তৈরী রসায়নের গুণে ব্যাদি আর তাঁর স্ত্রী নাকি উড়ে যেতে পারতেন যেখানে খুশি। রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে তিনি নাকি বইই লিখে গেছেন অনেক। লোকের ধারণা, আলবেরুণীর সময়েও জীবিত ছিলেন তাঁরা।

ধার শহর মালবের রাজধানী। সিংহাসনে রাজা ভোজদেব। এই ধার শহরের সরকারী ভবনের সামনে আছে একটা লম্বা টুকরো। এতে রয়েছে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুলেখ। আর এ নিয়ে চালু আছে একটা কাহিনী।

খুব প্রাচীন কালের কথা। একদিন রাজা ভোজদেবের কাছে হাজির হলেন একজন লোক। সঙ্গে এমন সব রসায়ন যা নাকি পারে যে কোনো মানুষকে অমর, বিজয়ী আর অপরাজেয় করে তুলতে। রাজাকে অমর হওয়ার প্রস্তাব দিতেই রাজা রাজী। বিশেষ দিনে বিশেষ জায়গায় রাজাকে তিনি জানালেন একা দেখা করতে।

বিশাল একটা কড়াইয়ে কয়েকদিন ধরে ফুটছে বিশেষ ধরনের তেল। তেলটা যখন ঠিক দরকার মতো রঙ পেল, লোকটা রাজাকে জানালে, এবার আপনি ঝাঁপ দিন। শুনে ভয় পেলেন রাজা, রাজার ভয়টা বুঝতে পেরে লোকটা বললে, আপনি যখন ভয় পাচ্ছেন, তখন ঝাঁপ দিচ্ছি আমিই। তবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। কয়েকটা ওষুধ রাজার হাতে তুলে দিয়ে কোন সময়ে কোনটা প্রয়োগ করতে হবে রাজাকে সব বুঝিয়ে লোকটা ঝাঁপ দিল ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে। খানিকটা পরেই লোকটা একটা দলা-পাকানো মণ্ড। নির্দেশ মতো রাজা পুরিয়া ঢেলে চলেছেন। যখন শেষ পুরিয়াটা বাকী, হঠাৎ তাঁর মনে হল সত্যি সত্যি বেঁচে উঠে এবং অমর আর অপরাজেয় হয়ে লোকটা যদি আমাকে, আমার রাজ্যকে বিপদে ফেলে? শেষ পুরিয়াটা তিনি ঢাললেন না, তারপর কড়াই যখন ঠাণ্ডা হল, তখন দেখা গেল, কড়াইয়ে পড়ে

আছে একটা রূপোর ডেলা।

আলবেরুণীর সময়ে সব রাজাদের মধ্যেই ছিল সোনা তৈরীর লোভ। এজন্যে যে কোনো সর্তে রাজী হতে আটকাবে না তাদের, আলবেরুণী জানাচ্ছেন।

"এজন্যে যে কোনো সংখ্যক সুন্দর শিশুকে হত্যা করতে বললেও পিছ্‌পাও হতেন না তাঁরা। অনায়াসে তাদের ছুঁড়ে দিতে পারতেন আগুনে। যদি এই সব রসায়ন শাস্ত্রকে নিষিদ্ধ করে পৃথিবীর এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতো যেখানে তার হদিশ পাবে না কেউ, তাহলে ভালো হতো। তন্ত্রমন্ত্র আর যোগ বিদ্যায় হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস। যে বইয়ে এসব নিয়ে লেখা সেটা নারায়ণের বাহন গরুড়ের রচনা বলে তাঁদের বিশ্বাস। যাদের সাপে কামড়ায় তাদের উপরই তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ চলে বেশি।"

আলবেরুণীকে একজন লোক এ নিয়ে গল্প শুনিয়েছিল একটা। গল্পটা এই রকম—একজন লোককে সাপে কামড়ালে তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয় তাকে। বেঁচে উঠে লোকটি নিজের ইচ্ছাপত্র তৈরী করে, কোথায় কত টাকা আছে, কার কি প্রাপ্য আত্মীয়-পরিজনকে সব জানিয়ে দেয়। তারপর সে যখন একটা থালার গন্ধ শুঁকলো, সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো আবার।

আলবেরুণী জানাচ্ছেন

"যদি কাউকে সাপে কামড়ায় আর সেখানকার আসে-পাশে ওঝা না থাকে, হিন্দুদের রীতি হলো তাকে পাতার উপর শুইয়ে ভেলায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। পাতায় লেখা থাকে, যদি কেউ তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে লোকটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে তার কল্যাণ হবে।" আলবেরুণীর বইয়ে এ রকম আশ্চর্য কাহিনীও অনেক। খোলা চোখে ভারতবর্ষকে দেখেছেন তিনি। খোলা মনে লিখে গেছেন। আমাদের অতীত ভারতবর্ষ তাঁর লেখায় জীবন্ত।